# নতুন কবি স্মরণে

রিফাত চৌধুরী

অতিক্রম প্রকাশনী

৫ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০।

নতুন কবি স্মরণে
রিফাত চৌধুরী

**প্রকাশকাল**
বৈশাখ ১৪১৮, এপ্রিল ২০১১

**স্বত্ব**
উষান মৌলিক, শিল্পা তিস্ া

**প্রচ্ছদ**
জুঁইফুল চৌধুরী

**অক্ষরবিন্যাস   মুদ্রণ**
কালজয়ী প্রকাশনী অ্যান্ড কম্পিউটার্স
৫ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

**মূল্য**
একশত টাকা মাত্র

## মুখবন্ধ

এ কাহিনী আমার নয়। আমার বন্ধু জুঁইফুল চৌধুরীর। জুঁইফুল চৌধুরীকে আপনারা হয়তো অনেকে

চেনেন, অনেকে চেনেন না। জুঁইফুল চৌধুরী গত ত্রিশ বছর ধরে সাহিত্যের সেবা করে আসছে। সেবা কথাটা বোধহয় অতিশয়োক্তি হলো। কেন না কথাটার মধ্যে একটা নিঃস্বার্থ দানের ইংগিত উহ্য আছে। জুঁইফুল চৌধুরীর সেবার মধ্যে প্রত্যাশা ছিল। নাম, অর্থ ও প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা। যা সকল মানুষের মধ্যেই উগ্রভাবে বর্তমান থাকে। মানুষ নিজেকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায় না। ছড়িয়ে দিতে চায় অনেকের মধ্যে। জুঁইফুল চৌধুরী পারেনি। নাম, প্রতিষ্ঠা, অর্থ কিছুই তেমন করে অর্জন করতে পারেনি। শুধু একটানা ত্রিশ বছরের পরিশ্রমের হতোদ্যম তার শরীর ও মনকে ক্লান্ত ও বিষণ্ন করেছে। তাই বলছিলাম জুঁইফুল চৌধুরীকে আপনারা হয়তো অনেকে চেনেন, অনেকে চেনেন না। জনপ্রিয়তা দিয়ে তো আজকাল মানুষের পরিমাপ হয়। জুঁইফুল চৌধুরী জনপ্রিয়তা পায়নি। এ কাহিনীর পর যদি সে রাতারাতি জনপ্রিয়তা পায়, তাহলে বুঝতে হবে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া কিছু নয় এবং আত্মবিস্মৃত বাংলাদেশে এইটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ কাহিনী জুঁইফুল চৌধুরীর নিজের লেখার কথা। কিন্তু ও আর লিখবে না, কোনোদিন লিখতে পারবে না। আমি ওর শৈশবের বন্ধু। শেষ পর্যন্ত দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হলো। বিশেষ করে ওর ছেলেমেয়ের কথা ভেবে। তের বছরের একটি ছেলে ও বার বছরের মেয়ে আছে ওর। এবং তার ভবিষ্যৎ আছে। এ বই যদি বিক্রি হয়, যদি টাকা আসে, তাহলে জুঁইফুল চৌধুরীর অনেক পুরনো লেখারই হয়তো কাটতি হবে এবং তাতে তার ছেলেমেয়ের উপকার হবে। তারা মানুষ হতে পারবে, লেখাপড়া শিখতে পারবে। এসব সাত-পাঁচ ভেবে আমি লিখতে বসেছি। অবশ্যই লেখা আমার নেশা বা পেশা কোনোটাই নয়। সুতরাং লেখায় শিল্পের অভাব পেলে ক্ষমা করবেন।

## আমার ছাত্র মহিয়ান

ব্যাগ কাঁধে নিয়ে পথে নেমে এলাম আমি। বাস স্টপে এসে দাঁড়ালাম। প্রত্যেকেটি বাসেই উপচে পড়া ভিড়। বাসের থেকে কেউ আমাকে দেখছে কিনা তা আমি দেখছিলাম। কোনোও বাসে ওঠার চেষ্টাই করছিলাম না। আর করেও কোনো লাভ নেই। আমি এই ভিড় বাসে কোনো দিনই উঠতে পারি না। ভিড়ে ছিটকে যাবে আমার কাঁধের ব্যাগ। বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে পায়ে ব্যথা হয়ে যায়। তবুও দাঁড়িয়ে থাকি। একবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম। না প্রথম ক্লাসটা বুঝি নেওয়া গেল না।

হঠাৎ একটা সিএনজি এসে দাঁড়াল বাস স্টপে। বাঁ দিকে দরজাটা খুলে দিয়ে ছেলেটি বলল ‘চলে আসেন স্যার’। আমি একটু যেন অবাক হয়ে গেলাম। পিছনের গাড়ির হর্ণের শব্দে কিছু শোনা যাছিল না। একটু নিচু হয়ে সিএনজির ভিতরে আবার তাকালাম আমি, সত্যিই কি আমাকেই ডাকছে সিএনজিতে বসে থাকা ভদ্রলোক।

আবার বলল ‘চলে আসেন স্যার’। আমি আর দেরি না করে শরীরটা ঢুকিয়ে দিলাম সিএনজির ভিতরে। আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করল ‘কি হলো স্যার, আমায় চিনতে পারছেন না?’ মোড়ে সিএনজিটাকে টার্ণ নিয়ে বলল‘আমি আপনার ছাত্র

মহিয়ান, মহিয়ান চৌধুরী। সবাই আমাকে মহান বলে ডাকতো। ছোটবেলায় মৈমনসিংহের স্কুলে পড়েছি। মৈমনসিং বাজারের সব চাইতে বড় ও জনপ্রিয় স্টেশনারি দোকানটি ছিল আমাদের। আমি লেখাপড়ায় খুব একটা ভালো ছিলাম না। কোনোদিনই দশজনের মধ্যে হতে পারিনি স্যার।' আসলে চিরকাল লাস্ট বেঞ্চের ছাত্র মহিয়ান। সব শিক্ষককে হতাশ করেছি আমি।

অবশেষে আমি না বলে পারলাম নাঃ একদিন তো আমি ভাড়া দিতে পারি। ও বলেছিল : স্যার তা কি হয়, আপনাকে অনেকদিন কাছে পেলাম, এটাই তো আমার অনেক পাওয়া। আপনি সবসময়ই অনারেবল গেস্ট। এমনি করে প্রতিদিন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে গন্তব্য থেকে ফেরা, ফেরা থেকে গন্তব্য করি।

## চাকরি চলে যাওয়ার পর

সিএনজি থেকে নামলাম অফিসে। দু-তিনজন পরিচিত অফিসারদের সঙ্গে দেখা হতেই তারা পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। আমি হেসে কথা বলার চেষ্টাও করলাম। কিন্তু কেউ তেমন পাত্তাও দিলেন না, গেটে দায়োয়ানরা দাঁড়িয়ে ছিল, আমার সামনেই, যারা দারোয়ানদের সামনে দিয়ে ঢুকছিলেন, দারোয়ান তাদের প্রত্যেককে স্যালুট করল। কিন্তু আমাকে তা করল না। হয়তো করেছে, নয়তো করবে ভেবে আমি দারোয়ানদের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু কোথায়! সকলে মুখ ফিরিয়ে সরে গেল। নিজের কাজে মন দিল।

লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সকলকে প্রায় ডিঙিয়ে প্রথমেই লিফটে উঠতে যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু লিফটম্যান বলে উঠলো'সরে যান, প্রথমে অফিসার লোককে চড়তে দেন?'

এবার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল আমার, কেন আমি কি অফিসার নই তবে? আমি তো ওদের থেকে সিনিয়র!

অগত্যা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো। উঠে হাঁপিয়ে গেলাম আমি। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। আমার ঘরের দরজায় নেম পেটটা তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে আরেকজনের নাম। ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলাম। দরজায় একজন ষণ্ডা-মার্কা লোক বসে আছেন। জোর করে ঢুকতে গেলাম, ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম আমি। কান্না পেয়ে গেল। কেঁদে ফেললাম আমি। কেঁদে উঠলাম, সত্যি সত্যি কেঁদে উঠলাম। আমি হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগলাম কিন্তু এই কান্না যে অরণ্যে রোদন সে কথা আমি জানি না, জানতে চাই না। কেউ আমার চোখের পানির মূল্য দিতে আজ আর রাজি নয়।

## রোশেনারা

তুমি কতো কথাই তো কতোবার বলেছো, আমার তা শুনতে কোনোদিন একটুও খারাপ লাগেনি। ভালো লেগেছে। আজও লাগবে। তোমার কথাই তো আমি শুনতে চাই।

তুমি পুরনো কথা ফিরিয়ে আনো, পুরনো দিগগুলিকে ফিরিয়ে আনতে পারো না?
এক একটা দিনকে ফিরিয়ে এনে থামিয়ে রাখতে পারো না?
তুমি বিয়ে করো না, তবেই তো সে দিনগুলি ফিরে আসবে।
ফুরিয়ে যাবে, আবার ফিরে আসবে। থেমে না হয় না-ই রইল। রোশেনারা, তুমি বিয়ে করো না।

রোশেনারা, তুমি কিছুতেই বিয়ে করো না। এক অর্থহীন সনির্বন্ধ অনুরোধ।
আমার দুচোখে অনুনয়, প্রত্যাশা।

## মারমেড

শ্রাবন্তী দত্ত তিন্নি
তিলোত্তমাসু

মৎস্যকন্যা, ফিরে যাচ্ছি বিদায়ের বাসটা হর্ন মারছে বুকের ভিতর
আর সময় নেই তোমার সঙ্গে পাশাপাশি বেড়িয়ে আসি কুয়াশায় ঢাকা ঘুমন্ত পাহাড়

ক্যাফের ভিতর বসে পেটে কাঁটা চামচে বাজাই বসন্তের সুর।
নীলাম্বরী সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে কবিতা মনে পড়ে ক্রমন্বয় নির্জনতা
মৎস্যকন্যা, তোমার খোঁপায় গোজা জংলীফুল তিব্বতের সাবানের বিজ্ঞাপনে সুন্দরীতমা হয়ে থাকো
সাবান তো নয় যেন এক টুকরো বাংলাদেশ পেলাম। ওকে বেশি করে দেখছিলাম।
তিনি যেন আরো স্মার্ট হয়েছে। সারাটা দেহ ও মনে বইছে জোয়ারের স্রোত।
এখনো তোমার খোঁপার মধ্যে জংলীফুল হয়ে বেঁচে আছি
কালো খোঁপার ফুলগুলি অতলস্পর্শী অন্ধকার খাদ
সে এক নিষিদ্ধ অন্ধকার অথচ আলোয় চেয়ে দেখো
কত আশা বীজ থেকে অঙ্কুর ছিঁড়ছে স্বপ্নের কঙ্কাল নিয়ে খেলা করছে প্রেত।
সমুদ্র তরঙ্গ বুকে আছাড়িপাছাড়ি করছে। শুভ্র ফেনপুঞ্জে নিজেকে আড়াল করা যায় না।
ঢেউ আমাকে উন্মোচিত করে দিচ্ছে। যার নিজস্বতা বহু থেকে বিচ্ছিন্ন একক গোপন সত্তা,
সুপ্ত ক্ষুধা শরীরের, সংসার নির্মাণের সে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে।
বর হওয়ার কল্পনা তাকে স্বচ্ছন্দ দুটি ডানা দিয়ে দেয়।
মেয়েদের বক্ষলগ্ন হওয়ার আশ্রয় তাপ আকুলতা রক্তকে চঞ্চল করে।

ক্যাফের ভিতর মুখোমুখি কিচেন রুমের অনুমেয় কবোষ্ণতায়
মনে পড়ে এই মুহূর্তে আজীবন দুঃখের নির্ণেয় পতাকা
মৎস্যকন্যা, এই বিদায় বেলা বাসটা বুকের ভিতর হর্ন মারতে মারতে ছেড়ে যাচ্ছে কক্সবাজার
এমন সময় জানালার ফাঁকে আমার নিঃসঙ্গ চেয়ে থাকা দেখে তুমি হাত নেড়ে স্বাগত জানাবে না?
ফেরার পথে বাসে আমি জানালার দিকে। বিকালের ফালি রোদ জায়গায় জায়গায়।

আমি বাসের জানালার বাইরে চোখ রাখি। সন্ধ্যা নামছে চট্টলায়।
দিন অবসানের আলো আকাশ গড়িয়ে ক্রমে নিঃশেষিত হচ্ছে।
শব্দ করে বাস ছুটছে। বাসের সতর্ক চাকা পিচের লাইন গড়িয়ে যাচ্ছে।

## পরবর্তী আকর্ষণ

রক্ত ঝরছে অলিগলিতে, রাজপথে। সময়ের মাথা কাটল, কপাল ফাটল,
দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। সময়ের সারা মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা।
মৃত্যু মিছিলের স্রোতে পাবন আনে দিকে দিকে। বন্দুকের নল থেকে একটি বুলেট গিয়ে বিঁধল
নগর ভবনের জৈবিক-ঘড়ির বুকে। সে স্তব্ধ হলো। এই স্তব্ধ সময়ের পাদদেশে, অস্ত সূর্যের আলোয়, আমিও কিছু সময়ের জন্য মূক হয়ে যাই। আমার বুকের সব শিরা-উপশিরা কে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেল। রক্তে ভেসে গিয়েছিল ছিন্ন সময়, রাস্তায় রাস্তায় শুকনা রক্ত। মানুষ এখন খুনাখুনিতে তিতিবিরক্ত। সময়ের দেহ ও ছিন্ন মস্তক। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে গলায়, কাঁধে, বুকে।
তাজা রক্তের ভয়ার্ত গন্ধ। সময়ের সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ।
এটা আমারই অঙ্গ। একান্ত নিজস্ব রক্তক্ষরণ। আমার নিজের, অন্য কারো নয়।

## টুয়েন্টি ফোর ফে‹‹মস অব ফে‹‹শ

আলো সরয়ার : আই মীন মোস্তফা সারওয়ার ফারুকী। সরয়ারের শির আজ যশোদ্ধত, ঐশ্বর্য গর্বিত। সরয়ার এই বাংলাদেশের উন্নত শির। পরিবার ও আলার কাছে সরয়ার যেন ভোরের আকাশ শান্ত, সুন্দর ও ¯'i››। ঢাকা শহরে একমাত্র সরয়ারই যার নামে কেউ কাদা ছুঁড়তে পারেনি। মেয়েঘটিত কোনও কেচ্ছা তাকে স্পর্শ করতে পারেন। খ্যাতির পাখায় ডানা মেলা, এখন তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ এভারেস্ট-ছুঁইছুঁই যে খ্যাতির চ‚ড়ায় সরয়ারের এখন অনায়াস ঘোরাফেরা করে সেখানে অধঃপতনের কত লোভ আর হাতছানি। এই লোভ আর হাতছানি বেয়ে অহরহ কত গ্রামপতন হয়ে যায় শহরে। কান পাতলে শোনা যায় সেই গ্রামপতনের শব্দ। সরয়ারকে কিন্তু কোনও হাতছানিই টানে না। জীবন রসে পূর্ণ সরয়ার বিØান বুদ্ধিমান রোমান্টিক। বুদ্ধির সাথে রোমান্টিসিজমের কোথায় সংঘাত আছে। রোমান্টিসিজম বুদ্ধিকে বেশ ভোঁতা করে দেয়। তাই শ'-এর 'এলেনভিটল'-এর মূর্ত প্রতীক সরয়ার কথায়, কাজে ও চিন্তায় বিরোধ বাধিয়ে ফেলেন। বয়স তাঁর কম তাই ভাবাবেগ বêা লাগিয়ে সংযত করতে হয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, যৌন-সমস্যা, ব¯'বাদ, ভাববাদ, Ø›Øমূলক ব¯'বাদ অনেক কিছু নিয়েই তাঁর সাথে আলোচনা করেছি, তর্ক করেছি। ঘÈার পর ঘÈা কেটে গেছে, সরয়ারের আগ্রহের বিরাম নেই শুনবার এবং

বুঝবার। সরয়ার যে একটু পানাসক্ত সেটা তো নিজের চোখেই দেখেছি। আরে না না, সে মদ্যপান নয়। এ পান হলো গাছের পাতা। চুন কাঁচা সুপারি দিয়ে খায়। পরিচালক হবার পর প্রায় দুটি দশক ধরে তিনি বহু পরিবারের অন্ন যুগিয়েছেন। আলো সরয়ার বহু মানুষের মুখে অন্ন যোগায়। একজন আসল কমিউনিস্ট। অসাধারণ সমালোচক থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শক অবধি সবাই প্রশংসার বুলি আওড়ান। আর যিনি ঐ কাণ্ডটি করেছেন অর্থাৎ ছবির স্রষ্টা মুচকি মুচকি হাসেন।

তিনি নিজের সহকারীর ওপর আস্থাবান হলে পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। এর ফলে যার কাজ শেখার ইচ্ছা থাকে সে হাতে-কলমে কাজ শিখাতে পারে। তাছাড়া ছাত্রাবস্থায় যেমন পড়া মুখস্থ করে ক্লাসে যেতে হয়, সরয়ারের কাছেও সবকিছু নখদর্পণে রেখে কাজ করতে হয়। কারণ চিত্রনাট্য না দেখেই ওঁর কাছে জবাব দিতে হবে কোথায় কি আছে।

পরিচালনার ব্যাপারে সরয়ারের প্রধান গুণ হল শট টেকিং ও অভিনয় জ্ঞান। তাঁর নিজস্ব একটা ভঙ্গিমা আছে সেটা সহজ অথচ যথাযথ এবং বাহুল্য বর্জিত।

সরয়ারের অভিনয় জ্ঞান অত্যন্ত সূ2। শিল্পীকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে বন্দি করার যাজু জানেন তিনি। স্টেজের অভিনয় ও ক্রিনের অভিনয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে, এবং সরয়ার এটা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন। আজকের যুগের কয়েকজন প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর হাতেখড়ি তাঁর কাছে।

আলী ফিদা একরাম তোজো : আলো সরয়ারের উপযুক্ত সহকারী। কিছুই তিনি ভোলেন না। সদাসতর্ক মিষ্টভাষী জ্ঞানী নিভৃতচারী আলী ফিদা একরাম তোজো।

মারজুক রাসেল : কবি, অভিনেতা। গ¤Ůীর অন্যমনা খুঁতখুঁতে মারজুক রাসেলের কী হলো? তিনি এখানে হয়ে উঠেছেন চঞ্চল, হাসিখুশি প্রগল্‌ভ। আশ্চর্য হয়েছি যখন দেখেছি তাকে গান গাইতে। (দারুণ-দারুণ অনেক গানের রচয়িতা তিনি।) খুশির আমেজে তিনি পলাশকে ট্রলিট্রাক বসাতে বলে যাচ্ছেন। তিনি যেন প্রোডাকসন-বয় থেকে পরিচালক সব কিছু।

সুব্রত রিপন : একজন মানুষ যে তাঁর কাজের সাথে কিভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে তা সুব্রত রিপনকে এই আউটডোরে না দেখলে বুঝতাম না। চারিদিকের গল্প হৈ-চৈ গানের মাঝে সুব্রত রিপনের মুখে একটি কথা নেই মনে হচ্ছে তিনি তাঁর ক্যামেরার চোখ লাগিয়ে সমস্ত বিশ্বটাকেই দেখে নিতে চাইছেন। ছোট একটি ঘটনা বলি, সদা হাস্যময়ী আনন্দোচ্ছলা অমায়িক বাংলাদেশের নায়িকা তিশাকে যেন নতুন রূপে আবিষ্কার করেছিলাম। প্রস্তর কঙ্কালকে কম্পোজ করে তিশার শট নেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। তিশাকে স্পটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে হঠাৎ তিশা গাইতে শুরু করলেন। সবাই তাঁর গান উপভোগ করছে হাসি ঠাট্টা চলছে কিন্ত সুব্রত রিপনের মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। তার কাছে যে একটা গান হ”Q তা যেন তিনি জানেন না। বারে বারে তিশার মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে যারা রিফ্লে±র করছিল তাদের রিফ্লে±র যথাস্থানে বারবার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। তিশা রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘ধ্যাত তেরি, টিë-ডাউন আর ফিë-আপ, বেরসিক কোথাকার!’ এতেও

সুব্রত রিপনের খেয়াল নেই, তিনি তার কাজ করেই চলেছেন। বাধ্য হয়ে তিশাই বন্ধ করলেন। আলো সরয়ারকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই সরে গেলেন পৃথিবী থেকে। ঠিক দুবছর আগে ক্যানসারে মারা গেছেন। আলো দিয়েছে, যে এসেছে কাছে, তাকেই। এখন নিভে গেছে নিশ্চিýহয়ে, কেউ হাহাকার করবে না। রিপন ছুটবে আর একটা রূপ-বর্ýির আলোর আমন্ত্রণে।

আলোছায়ায় বসে আছেন আলো সরয়ার। আলোছায়ায় বসে আশমানি মঞ্জিল গড়ে মনে মনে।
আলোই তাঁকে বেঁচে থাকার বার্তা পাঠিয়েছিল।
শোকে দুঃখে তিনি যখন ভেঙে পড়েছিল তখন তাঁকে নতুন দিনের আলো দেখিয়েছিল
আলোকচিত্রগ্রাহক সুব্রত রিপন। তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই সরে গেলেন পৃথিবী থেকে।

পলাশ ট্রলিট্রাক বসাতে লেগে গেছে বহির্দৃশ্যে স্বপ্নের বিশাল লোকেশনে।
শুভ সেটে বসে পড়া তৈরি করছে। যখনই পড়তে বসে তখনই সিনেমার চিন্তা মাথায় ঢোকে
এই রকম সাংঘাতিক অবস্থায় লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী।...ক্যামেরার রোল চালালেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছুটে আসবে কিশোর ছেলেটি। পড়া শিকায়, ঘুম শিকায়, খেলাধুলা শিকায়। বইপত্তর ফেলে দিয়ে মনিটরের সামনে গুটি মেরে বসে যাবে সে।...

আমি : এ কি, শুভ পড়ছ না?
শুভ : (মাথা চুলকিয়ে) মানে।
আমি : মানে? সিম্পল কোশ্চেন, পড়ছ কি পড়ছ না? ইয়েস অর নো,
এর মধ্যে আবার মানে আসে কোত্থেকে?
শুভ : জী পড়ছিলাম।
আমি : সে দ্যাট্, পড়ছিলে। তা নয় যতসব মানে, আচ্ছা, হেন, তেন, কি যে হয়েছে তোমার বুঝি না। (দেন সাডেনলি) পড়ছিলে? পড়ছিলে মানে? এখানে বসে... ওদিকে তাকিয়ে হা করে কি পড়ছিলে তুমি?
শুভ : না, না, ঠিক পড়ছিলাম না।
আমি : সে কি কথা! এই তো বললে পড়ছিলে? আবার এখন বলছ পড়ছিলে না তাও আবার সিওর নও। এর মধ্যে আবার ঠিক-বেঠিক কি?
শুভ : জী মানে।
আমি : সে ইয়েস অর নো।
শুভ : নো।
আমি : সে দ্যাট্।

(সেই কিশোর শুভ এখন পরিচালক শুভ রায়হান!)

আশেপাশের একটি জানালা খুলে গেল।
একটি মহিলা মুখ কৌতুকে কৌত,হলে আকড়ে ধরল জানালার শিক।
অপরিচিতা বয়স্থা মেয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরি আমি।
দুর্ভাগ্যবশত বাড়িটি অকস্মাৎ Øার রুদ্ধ করল।

বারে বারে তিশার মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে রিফ্লে±র করছিল।
টিë-ডাউন আর ফিë-আপ, বেরসিক কোথাকার! কাঠখোট্টা নীরস।
এই রিপন কি নিষ্ঠুর তুমি, (এবার হাত না তুললে প্রস্তর ছুঁড়ে মারব)

আমি দুটো সিনেমায় অভিনয় করেছি। বোবা ছেলের পার্ট একটাতে, অন্যটায় সাইড রোল।
বোবা ছেলের অভিনয়, ওরে বাপ্স্, দারুণ ব্যাপার সোজা কথা?
আমি সেই ‘নিখোঁজ সংবাদ’ সিনেমায় করেছিলাম এখনও জ্বলজ্বল করছে।
দুটি ছবিতে আমিই ছিলাম নায়ক। ‘কোথায় পাবো তারে’। ‘টেটমেন’
আলো সরয়ারের পরবর্তী ছবিতে ‘টেলিভিশন’ আমি অভিনয় করবো কি-না তা গল্পের ওপর নির্ভর করছে।

আলোছায়ায় বসে আছেন আলো সরয়ার উপর দিকে তারপর আরও উপর দিকে,
আরও আরও আরও। আমার মনে হতে লাগলো তাঁর উন্নতির ব্যাপারে আকাশই শুধু সীমানা।
(আকাশের সীমা নেই) আলো সরয়ারের এখন একাদশে বৃহস্পতি যাকে বলে বুম পিরিয়ড।
আমার মাথার ওপরে কেউ নেই। সেখানে অসীম আকাশ। সেখানে আলো, অন্ধাকার, বিদ্যুৎ, বজ্র,
ঝড়ের উপাদান- কী নেই, সব আছে। আকাশখানা অনেক বড় কিনা?
আর বিরাট আকাশের নিচে আমাকে মনে হয়, ভীষণ ছোট। ছোট্ট একটি ডাহুক।
আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় নীলিমায় চলে যাই। নীলিমায় দেখি আমি একমাত্র বুদ্ধিমান জীব।

তিনি যেন যে কোনো ছবির সবার মূলে যিনি অর্থাৎ লেখকের (এখন পরিচালক নিজেই কাহিনীকার)
একটি ছবি চলচ্চিত্রের সঙ্গে দেখার জন্য পরিচালক আলো সরয়ারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।
(আমার কোনো গল্প সিনেমায় হবে বলে মনে করবেন না যেন!)

নতুনতর পরিবেশে নতুনতর সুস্থ চরিত্রচিত্রণ ইদানীং দেখা যাচ্ছে আলো সরয়ারের ছবিতে।
কতগুলি ছবির নাম দিচ্ছি যেগুলির নতুনত্ব দেখে আশা জাগে।
‘ব্যাচেলর’, (দাম্পত্য জীবনের সুখ-সমৃদ্ধগুলি অদাম্পত্য সম্পর্কগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে।)
‘মেড ইন বাংলাদেশ’ ‘লোকগীতিপ্রেমিক অভিনব এক চরিত্রের কাহিনী।’
‘থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার’ ‘তিনটি বিষণ্ন আকাশ’।
আরো এরকম সুস্থ কাহিনী, নতুনতর পরীক্ষা হ”Q বাংলা ছবিতে।
যা হয়তো আমার কানে আসেনি। মোট কথা বাংলা ছবির অগ্রগতি শুরু হয়েছে।

শম্বুক গতি তবু অগ্রগতি। অধোগতি নয়। আশার কথা।
ক্রিন ট্রিটমেন্টে আধুনিকতার ছাপ পড়েছে মাত্র।
আলো সরয়ারের প্রতিটি ছবি সফল হোক আর সেই সাফল্য থেকে প্রাণ পাক ক্ষয়িষ্ণু বাংলা চলচ্চিত্র।
শেষ কথা আমার সেই পুরানা অনুজ অভিন্নহৃদয় বন্ধুবরকে অনুরোধ বাংলাদেশকে উনি যেন ভুলে না যান ভুলে যেন না যান উনি ওঁর উৎসকে।

## দূরপালার রেলগাড়ি

জীবনকে জেনেছি। অন্তত সারা জীবন অধ্যয়নের (অভিজ্ঞতার?) মধ্য দিয়ে আমি যতটুকু জেনেছি।
জীবনটা দূরপালার রেলগাড়ি। কতো যাত্রী ওঠে কতো যাত্রী নেমে যায়।
যতোক্ষণ একসঙ্গে এক কমপার্টমেন্টে, কতো ভাব, কতো গল্প, কতো আলোচনা,
গাড়ি থেকে নেমে গেলে কে আর কাকে মনে রাখে।
সারা পৃথিবীটাই যেন একটা ইস্টিশন। কেউ আসছে কেউ যাচ্ছে।

## জলে ঢেউয়ের মতো

ছলাৎ-ছলাৎ বেজে ওঠে নদীর সংগীত, পাড় ভেঙে আপন উচ্ছ্বাসে।
তুমি অতি উত্তম। তোমার জুড়ি নেই। তুমি তো অমৃতে ভরা।
তুমি আমার দুটি ফুসফুস। আমার হার্ট।
তুমি কেবল ফার্স্ট ক্লাস নও একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।
তুমি আমার কাছে একটা আবিষ্কার।

আমি চঞ্চল। আমি অধীর। আমি নদীর পাড়। তুমি নদী। বয়ে যাও। সমুদ্র অনেক দূর।
তোমার নদী বয়ে যাচ্ছে কোনদিকে? কোথায় উজান?
তোমার জীবনের মরাগাঙে আমি ভাবের বন্যা বইয়ে দিয়েছি।

বর্ষার পঙ্কিল নদী পরপুরুষের ছলাকলায় বিভ্রান্ত রমণীর মতো সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়ে।
ঢেউ গুনছি সমুদ্রে। ঢেউয়ের পরে ঢেউ। ঢেউয়ের পরে ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় ফেনার মুকুট।
যে উৎসবের ঢেউ উঠবে তারই ছোঁয়ায় জেগে ওঠা সাথী ঢেউদের চলার গতিতে এ আবেশের রেশ চলবে অনেকদিন।

ধরে রাখতে না পারলে চলে যাবে। ঢেউ আমায় ছেড়ে চলে গেল। ব্যাড লাক।
শরতের মেঘের মতোই এখন আমার জীবনে সে অস্তিত্বহীন।
এমন কতো আসে কতো যায় জলের স্রোতের মতো,
আমি সেই চলমান ঢেউয়ের জল হিসাব করে রাখি।

## লাল কঙ্কাল

ভাঙা আরশীতে মুখ দেখার স্বভাব এখনও আছে। যখন বউটা বেশি উতলা হয়, বেশি ঘর-বার হয়, তখন আরশী নিয়ে দাওয়ায় বসে গোঁফ টেনে টেনে বড় করি। জীবন দর্পণের দাঁড়ি টানি। হাজা-মজা মুখটার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটি। বলি, বাহবা : বাহবা : তোমার যোয়ানকি তবে গেল রে।

শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা কিছুই তো আর নেই এখন। এখন আর ওসবের সময় নেই।

তোমার বউ এখন ঘর-বার হলো রে। বাহবা : বাহবা :। আরশীর মুখটা তখন ভেংচি কাটে, আয়না মিথ্যা কথা বলে না। বলে মরো, মরো, মরো। সব দিন এক সমান নেহি থা।

আমার শরীরটা কঙ্কাল আছে, লাল কঙ্কাল। আমার কঙ্কাল দোসরা কঙ্কাল খুঁজতে যাচ্ছে।

## ভ্রমণ

কক্সবাজারে আগেও এসেছি। আমার এক আর্টিস্ট বন্ধু থাকে কক্সবাজারে।
ভিন্ন গ্রহের প্রাণীর নামে নাম। একটার পর একটা হোটেল সমুদ্রের পাড়ে।
ওর মারমেড নামে একটা ক্যাফে আছে। আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান থেকে প্রচুর পর্যটক আসে।

সস্তা হোটেলের সংখ্যাও অনেক। সারি সারি দোকান, রেস্তোরাঁ।
এখানে একটা দারুণ সাজানো বাজার আছে পর্যটকদের জন্য।
উঁচু উঁচু আকাশ ছোঁয়া হোটেলের ছড়াছড়ি।
দু-এক বছর পরপরই এই জায়গার স্কাই লাইন দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

কানে সামুদ্রিক কোলাহল বুকের মধ্যে দু-এক পশলা আয়েশি সব দুঃখ পুষি।
আমাদের হোটেলটা ছিল সমুদ্রের খুব কাছে সমুদ্রের শব্দময় হৃদয়। দামী হোটেল।
পাঁচ মিনিটেরও কম পায়ে হাঁটা পথ। আমার এমনি যাওয়া এমনি আসা।
সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কখন যেন বেলা নুইয়ে পড়ে।
দামী হোটেলের ঘরের মধ্যে পেচ্ছাব-গোসল করার জায়গা থাকে
এ হোটেলে তা ছিল। তাই সুবিধা ছিল হোটেলের বাথরুম স্লিপারগুলি পর্যটকদের পা।
রাতে মারমেড থেকে হোটেলে ফেরার সময় এই কথাই ভাবছিলাম।

## শহরের বনলতা

ভোর হয়েছে কিন্ত একে যেন ভোর বলে না বলা যায় না একে দিন
রৌদ্র নিছক অ্যালুমিনিয়মের মতো ধাতব!
দুপুর আকাশ থেকে গাঢ় তামা রোদ কলাবাগানের ধানলেকে ভেঙে ভেঙে পড়ে।

সকলেই জানে ছয় বাই আটাশের কলাবাগানে হাওয়া খেলে না। তবুও বলতে হয়,
জানালাটা খুলে, 'আহা কি আরাম বলো, এটুকু আকাশ ছাড়া, বাঁচা যায় কিসে?'
সেখানে কৃপণ রোদে শুকায় কাপড়। জানালা দিয়ে রোদ উঁকি দেয়-সংসারের অন্তঃপুরে।
মনের কন্দরে। কবে বন্ধ জরজা খুলে গিয়ে উদার হাওয়া ঢুকবে, তা আজও অনিশ্চিত!
বন্ধ দরজা খোলার জন্য কোনো চিচিং ফাঁকের কায়দা নেই।

শহরের চাদ্দিকে আতংক ডাস্টবিনে ভেসে ওঠে ময়লা ছবি।
আর ঘৃণ্য অনেক চোখ সরল গ্রাম্য যুবতীর চোখে
বিষাক্ত বাতাস বয় বিষণ্ন শরীরে। বাতাসে বিষাক্ত বিষ, আর হাহাকার।

আমার নিদিষ্ট ঘরে অশরীরী অরণ্যের ছায়া- ছাদের কার্নিসে বাড়ে জীর্ণ বটগাছ
স¤ধুখে পিছনে নগ্ন ক্রুর যাদু হাত অন্ধকারে প্রিয়সুখ বিভিষিকাময়।
ওই জানালার কাছে বসে আছে করতলে রেখে মাথা। শহরের বনলতা।
মানসিক চাঞ্চল্যে জেরবার মনে হয়। সূর্য পতনের আগে মন শুধু উৎকণ্ঠিত করে।

## নতুন আমি

দেয়ালে উড়ন্ত বক, একটা ক্যালেন্ডার। বারো মাসের ক্যালেন্ডারের পাতা ছিঁড়ে
আবারও ঢুকে পড়লাম আরও একটা নতুন বছরে।

বছরের প্রথম দিন একটা খুন করতে চাই। নিজেকে।
এই আমি বহু পুরানা। ব্যবহারে ব্যবহারে ঘষে গেছি অনেক।
পুরানা আমিটার বেঁচে থাকার আর দরকার নেই। দরকার কি?
নতুন একটা আমি নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াক।

সে খুন করার অর্থ বোধহয়, আমার জোয়াল টানার পালা শেষ, এবার তোর পালা।

## বংশবৃক্ষ

যৌবন জীবনে একবারই আসে, কিন্ত মাথা ঠাণ্ডা রাখলে একবারই যথেষ্ট।
আমারতো একটাই। তাকেই মাঝেমাঝে উেëপাë দেখি। যখন যা মনে আসে ভেবে জাপটে ধরি।
ধর্ষণ বলি, সহবাস বলি এই একটাই সম্বল।
আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে [সম্প্রতি আর একটি মেয়ে হয়েছে আমার]
এই মহাবিশ্বে কোনও কিছুই ধ্বংস হয় না এক মানুষের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় আরেক মানুষ, সে অবিনাশী চিরন্তন।

আমাদের নতুন মেয়েটিকে দেখলাম। এ দুনিয়ার কিছুই জানে না।
কোথায় পড়বে সে, কোথাকার মাটি ঠেলে উঠতে হবে জানে না এখনো।
শরীরে কেমন তেজ আছে? কে   জিতবে মাটি নাকি সে?
মাটি সহায়ক হবে? নাকি তার অনুর্বরতা তাকেই ভাঙতে হবে আপন প্রকাশ ভেঙেচুরে।
মেয়েটি ভালো আছে। চোখ বুজে ঘুমাচ্ছে। গড বী উইথ ইউ মাই চাই।

আজ মেয়ের কান্না শুনলাম। গলা ছেড়ে কাঁদছে। কী গলার আওয়াজ। বাপরে বাপ!
কান্নাহীন শরীরের অনুভ,তির মরা ত্বকে স্পর্শ কাতরতা আনতে হবে জানে না সে।

‘শু’ আর ‘ক’ দিয়ে ওর নাম ‘শুক’ কিন্ত তাকে তাহলে স্ত্রীলিঙ্গ থেকে
পুংলিঙ্গে রূপান্তরিত করতে হয়। তা না হলে ওর নাম রাখতে হয়, সারী।

ওকে ‘শুশুক’ বলে ডাকলে কেমন হয়। ওদের বুদ্ধিও যেমন উপকারও তেমনি।

## প্রায়শ্চিত্ত

সব অভিজ্ঞতাই বিষ, মানুষের ওপর বিশ্বাস বিনষ্টকারী। মনে হয় সব স্বার্থকীট।
অপরকে কুরে কুরে খাওয়াই বুঝি মনুষ্যকীটের ধর্ম।
কী অত্যাচার পৃথিবীর ওপর, পৈশাচিক ব্যাপার, ভাবা যায়?
আণবিক বোমা, জ্বালানি, অতিরিক্ত শিকার, গাছ কাটা।
মানুষ এই করে একদিন নিজেই শেষ করে দেবে নিজেদের।

মানুষকে বিশ্বাস করবার গর্ব হারিয়ে ফেললাম সম্পূর্ণ।
পৃথিবীতে সুস্থ মানুষের মতো বেঁচে থাকার পথ যদি বন্ধ হয়ে যায়,
তাহলে কাঁটার বিছানায় শুয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে লাভ কী?
সূর্য আছে স্থির আর পৃথিবী ঘুরছে তার চারধারে।
ভবিষ্যতে হয়তো দেখবো আমরাই ঘুরছি আর সব স্থির।

## গর্ভবতী মেঘ

ধানলেকের কলাবাগানে বাস স্টপে যখন নামলাম, তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।
ধানলেকের গাছের পাতাগুলি কী সা• ঘাতিক সবুজ। ওপরের আকাশটা কী বিপজ্জনক নীল,
আর ধানলেকের জল কী ভীষণ স্বচ্ছ। ব্যাগ থেকে ছাতা বার করে মাথায় দিলাম আমি।
রাস্তার আলোয় ছাতার ভিজে কাপড় চিকচিক করছে।

জেব্রা ক্রসিংয়ের মতো কিছু মেঘ। মেঘ হয়েছে, বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির ভিতর গান।
ইথারের বায়বীয় ছায়ামূর্তি দেখছি।

আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। মেঘ নেমে আসছে, বৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ছে জুঁইফুলের মতো।
ঝুমঝুম রিমঝিম বা নাগাড়ে টিপটিপ। কখনও আবার লাগাতার ঝমাঝম।
আগে তিনবার ছাতা হারিয়েছি, ভেজা রেনকোটের জন্য অন্যরা বিরক্ত হয়।

এক ময়ূরের জোড়া নতুন জোড়া ওয়েট লুকের মেঘময়ূরীর সঙ্গে
মেঘময়ূরের ডেট চলছে আকাশের বিশাল কিনারায়। আ”Qi ù,র্তি করছে দুজনে।
মেঘ-মাটিতে ওরা দুজনে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে নিঃসাড় নিস্পন্দ!
মেঘের মিলনের বেলা।
‘এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়... ।’ জলভরা মেঘে তখন আকাশ ভরে আছে।
পুরুষ্টু গর্ভবতী মেঘ। দূর আকাশের শিশু সান অফ রেইন।
চুল তার বাদলশেষের ঘন রাত্রির মতো।

গ্যারেজের ওপর ছোট্ট ঘরে এক কামরার বরসাতিতে থাকি।
টেপ-রেকর্ডারে ক্যাসেটে গান শুনি: শো মি দ্যা ওয়ে ইউ কিস,
কাম, সিট অন মাই ল্যাপ, উই হ্যাভ ওয়ান সিংগল বডি,
নেভার সে ডান তখন আমার সমাচ্ছন্ন সৌরমণ্ডল নিমিষে স্বচ্ছ সুনীল হয়ে গেল।

## রাজার মাথায় গাধার কান

গাধার কান গজিয়ে গিয়েছিল রাজার। চুল কাটতে এসে নাপিত দেখে ফেলেছিল সেই কান। কিন্ত রাজা হুকুম দিয়েছিলেন, এই কানের কথা তুমি কাউকে বলবে না। যদি বলো গর্দান যাবে তোমার। রাজার মাথায় গাধার কান এইরকম একটা ঘটনার কথা কাউকে না বলে পারা যায় না। কিন্ত বললে তা ঠিক পাঁচ কান হবে। তারপর সেই কথা রাজার কানে গেলে ওর মুণ্ডু কাটা পড়বে নির্ঘাত। বেচারা নাপিত কথা চেপে রাখতে রাখতে শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আশ্চর্য ঘটনাটার কথা কোনও একজনকে বলা দরকার, না হলে রোগ সারবে না। কিন্ত কাকে বলা যায়? নির্ভরযোগ্য তেমন লোক কোথায়?

হাঁটা থামাতেই হলো। খরগোশপুর গ্রামকে পিছনে রেখে কাঁচা রাস্তা ক্রমশ সংকীর্ণ হতে হতে এখন এক ফালিতে এসে ঠেকেছে। সামনে এবার অুনচ্চ, অজানা সব গাছপালার সবুজ সুড়ঙ্গ। অবিরাম বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে চকচক করছে লতাপাতা। তারই মধ্যে হাঁটু অবধি তবন (লুঙ্গি) তুলে চলেছে নাপিত। কাদামাটি ঠেলে আরও খানিক দূর গেলে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। তারপর নদী। কিন্ত হলে কী হবে, তাতে বানের স্রোত। সোঁ সোঁ করে বইছে হাওয়া। নদীর ওপারে আরও গভীর জঙ্গল। তার ফাঁক দিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া আকাশ দেখা যায়। নির্জন এলাকা থেকে আরও নির্জন এলাকায় ঢুকে পড়ছিল নাপিত। ভরা নদীর জলে সাঁতার দিয়ে বর্ষার মাঠ পেরিয়ে ছুটে আসা। গাছের ডালে-ডালে ফুলের সমারোহ।

শোনো গাছ, তুমি তো আর কাউকে ফাঁস করতে পারবে না। তোমাকে বলাই নিরাপদ। আমাদের রাজা সবসময় মস্ত একটা পাগড়ি পরে থাকেন কেন জানো? রাজার কান দুটো অবিকল গাধার কানের মতো। আমি ওর চুল কাটতে গিয়ে দেখে ফেলেছি। গোপন কথা গাছকে বলতে পেরে হালকা হলো নাপিত। ওর রোগও সারল। কিন্ত রাজার কপাল খারাপ। সেই গাছ কেটে বানানো হয়েছিল বাজনা। সেই বাজনাই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল রাজার কান গাধার মতো। ওয়ান থিং ইউ ক্যাননট ডাইজেস্ট, দ্যাট ইজ সিক্রেট। গোপন কেউ হজম করতে পারে না।

## পার্ক

পার্ক মানেই নেশা-ভাং-সাট্টা পার্ক মানেই মাস্তানি আড্ডা।<br>
...ওরা বড় বেশি কথা বলছে বড় বেশি কোলাহল।<br>
'কোলাহলতো বারণ হলো এবার কথা কানে কানে।'<br>
এবার সত্যিই কি তোমার সঙ্গে আমার কানে কানে কথা হবে?<br>
তোমার প্রতি আকর্ষণ আমার ঐতিহ্যগত ব্যাপার।<br>
তোমার গল্প আমি শুনতে চাই, তোমাকে আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই,

আমার অনুভ,তিতে, আমার বোধের মধ্যে পেতে চাই।
দেয়ারস আ গালফ্ অব ডিফারেÝ বিটুইন ইউ এন্ড মি।
আমার এই ভিড়ে ভাড়াক্কা পার্কটা ভালো লাগছে না, এ রকম জায়গা আমার ভালো লাগে না,
মনে হয় এসব প্রেমের পীঠস্থান, বহু ব্যবহারে মলিন। সংগীত-ভক্তদের তীর্থক্ষেত্র,
এখন আমার মনটা তোমাকে নিয়ে এত ভরা, এত চঞ্চল,
ইচ্ছা করছে তোমাকে নিয়ে পার্কের লাল ইটের খাড়াইটা
এক দৌড়ে উঠে যাই। দুজনে কিন্ত দৌড়ে খাড়াইটা উঠব।
সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে।
আজ আমাকে তোমার সাথী করো, চঞ্চলা।
ছলনা ও রঙ্গে ভরা চঞ্চলা রূপে যেন ফুলের মতো কোমলা!
চামেলীর গন্ধে আনন্দিতা...সুশ্রী। এবার গিঁট বেঁধে দেই।
চঞ্চলার জন্য সব ভালোবাসা রুমালে গিঁট বেঁধে রেখে দেই আমি।

## একটি দীর্ঘশ্বাসের কবিতা

কল্পিতা, কেমন আছ? কেমন আছ, কল্পিতা? তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, কল্পিতা।
আমি একেবারে বদলে গেছি। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারছি না।
রাতগুলি আমাকে হা করে গিলতে আসে। কল্পিতা, পিজ। আমার কথাটা শোনো একবার
তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না।

কল্পিতা, কেমন আছো? কল্পিতা, কথা বলছ না কেন? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।
একটিবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কল্পিতা... কল্পিতা... পিজ,
একবার আমাকে কথা বলার চাÝ দাও

কল্পিতা। আমি তোমাকে ফোন করলে কে কী মনে করবে। আফটার অল আমি তোমার স্বামী।
তোমাকে আমি প্রায়ই ফলো করি, তুমি টের পাও না। অফিসার আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে হৈহুলোড়
ফ,র্তি করতে করতে আমার কথা তুমি একেবারে ভুলেই গেছ। তোমাকে আমি দূর থেকে রোজ দেখি,
আর নতুন করে ভালোবাসায় পাগল হয়ে যাই

কল্পিতা, কেমন আছ? তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, কল্পিতা।
তোমাকে ছেড়ে আমি ভীষণ কষ্টে আছি। এতদিন এ-কষ্ট টের পাইনি, কিন্ত এখন টের পাচ্ছি।
তুমি আমার কাছে ফিরে এসো। আমার ফাঁকা জায়গাটা ভরে দাও।

নইলে আমি মরে যাব... বিশ্বাস করো। তুমি আমার বাড়িতে উঁহ্, আমার বাড়িতে নয়,
তোমার বাড়িতে ফিরে এসো, তোমাকে অনেক কথা বলব।
আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারো না, কল্লিতা? মানুষের কি ভুল হয় না।
অনুতাপে-অনুতাপে আমি জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখো

তোমার সন্তান এখনও আমাকে 'বাবা' বলে ডাকতে চায়।
আর আমি তোমাকে 'বউ' বলে ডাকতে চাই, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে চাই।
এখনও সময় আছে ফিরে এসো। তা না হলে ফল খুব খারাপ হবে।
'অ্যাকোয়া রিজিয়া'র নাম শুনেছ? না, সুলতানা রিজিয়ার কোনও আত্মীয় নন তিনি।
গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তৈরি এক মারাত্মক অ্যাসিড।
সোনাও গলিয়ে দিতে পারে অতি সহজে। এই অ্যাসিড ভরা বাল্ব তোমার মুখে ছুড়ে মারলে
তোমার ওই সোনার মতো রঙের কী হাল হবে বুঝতে পারছো?

তাই তোমার পায়ে ধরে বলছি, কল্লিতা, ফিরে এসো। আমাকে খারাপ হয়ে যেতে দিয়ো না, লক্ষীটি।

কেমন আছ, কল্লিতা? আমার কষ্টটা তুমি কেন বুঝতে চাও না বলো তো।
আমি যে একা-একা শেষ হয়ে গেলাম

কল্লিতা, একটিবার আমার সঙ্গে দেখা কর। তুমি পাশে না থাকলে আমি কেমন করে সেরে উঠবো?
কেমন করে আবার ভালোবাসবো তোমাকে?

কল্লিতা, তোমাকে আমি অনেক চিঠি লিখেছি রোজ তুমি অফিসে গেলেই একটা করে আমার চিঠি পাবে...
কল্লিতা, মুখটা তুলে আমার দিকে একবার তাকাও আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, কল্লিতা।
তোমাকে ফিরে না পেলে আমি মরে যাব। তোমাকে ফিরে না পেলে আমি শেষ হয়ে যাব, কল্লিতা...
তুমি ফিরে এসো। তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। কল্লিতা, আমি তোমাকে কতবার বলেছি...
কল্লিতা তোমাকে আমি ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না। কল্লিতা, তোমাকে আমি ছাড়ব না।

তোমার কাছে আমি মরমে মরে আছি। অন্তরের অতল হতে আত্মপ্রকাশ করল দুটি মৃত শব্দ।
আমি মরেছি। সব কথার প্রকাশ, সব আবেগের অনুরণন,
সব নীরবতার ঘনিষ্ঠতা সেই একটি ছোট কথার মধ্যে যেন সমাহিত হয়ে আছে।

তুমি... তুমি আমাকে... কল্লিতা, আমার কল্লিতা...
সেইসব মন জমানো রাত আর রূপ কি ভোলার! তুমি সেই দিনগুলির নায়িকা।

কল্লিতা, তুমি কী আমার কাছে আসবে, এসো না কল্লিতা। আমি যে একা থাকতে পারছি না।

তুমি ছাড়া আমার জীবন থমকে যাবে। আমি শুকিয়ে যাবো আদর-যত্ন না-পাওয়া কোনও চারাগাছের মতো।

[সংক্ষেপিত]

## মানুষ চায়রে

মানুষ চায় রে কারে চায় রে মানুষ শুধু টাকা চায় রে টাকায় মানুষ চায় না।

মানুষ তো মরে শুধু মানুষ তো টাকা বানায় রে টাকায় মানুষ বানায় না।

টাকা থাকলে সবকিছু হয় না হলে কিছু নয়। আমার টাকা আয় তো রে।

এই ঝিলিমিলি রাত মিষ্টি ফাগুন চোখে চোখে রঙ মনের আগুন।
ফুলের হাসি পাপিয়ার সুর যদি পকেট ভর্তি থাকে সবি মধুর।

## শিশু শয়তান

জঘন্য বউ প্রমাণ করা যায় আদালতে, কিন্তু জঘন্য জননী একথা প্রমাণ করা যায় না।
জননী যখন জঘন্য শিশু তখন শয়তান। আমার অনেক বদনাম। আমার শতেক দোষ
এটা আমার মস্তিষ্কগত দোষ আমার মাথার খুলি সুষম নয়। মস্তিষ্কতো রাবার নয় যে টানলেই বাড়ে।
আমি মানসিক রোগগ্রস্ত।
তিনমাস আমাকে থাকতে হয়েছিল একটি স্যানেটোরিয়ামে, Øায়বিক ব্রেকডাউনের চিকিৎসার্থে।
ছেলেবেলা থেকেই আমি গ¤©ীর প্রকৃতির, বিশেষ বন্ধু-বান্ধব নেই।
আসল বন্ধুত্ব কবিতা ও বোতলের সঙ্গে।
মাথার ভিতরে লোডশেডিং। মাথার ভিতরে লাট্টু ঘুরছে।
আমার SEA SICKNESS হয়নি কখনও।
কিন্তু SHE SICKNESS রোগে ভুগেছি অনেকবার।
SHE-রা আমাকে অনেকবার SICK করেছে। শি উল্‌ফ। নেকড়ে বললেই বুঝি খুব ধূর্ত।

আমি এমন একজন শিশু, যে কোনও দিন বড় হলো না।
খারাপ খারাপ আমি আমি আমি শিশু শয়তান, একটু একটু বাঁচাও আমাকে...
ডোন্ট কিল পিওর বাড। রক্তকে খুন করো না। রক্ত জলের চাইতে ঘন।
রেড ইজ দ্য কালার অফ প্যাশন। লাল আমার প্রিয় রঙ। পতাকার রঙ লাল।

রক্তের রঙও তো লালই। রেড ইজ নট ওনলি দ্য কালার অফ প্যাশন।
কবিতা আমার প্যাশন, এটা ছেড়ে থাকা খুব মুশকিল। কবিতা আমার রক্তের মধ্যে।
কবিতার সঙ্গে রক্তের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কবির হাত অনেক লম্বা।
মেঘই নয়, ওই হাত ধরতে গেলে বাধা আসবে রোদ থেকেও। প্রাণ আছে, তাই কবিতা আছে।
একটি মোমবাতি জ্বেলে বসি, যতক্ষণ না নেভে ততক্ষণ একটি কবিতাকে রচনা করতে থাকি।
আমাকে বসন্তের টিকা দিতে এসেছিল কবিতা। আমার কবিতা হলো কচ্ছপের জান।
আমার ভিতর একটা শক্তি আছে, সেটা আমাকে বলতে চায়, এই পৃথিবীতে আমি যেন কবিতা লেখার জন্যই এসেছি। যে দেশে কবিতা রচনা করি বলে আমি গর্ববোধ করি, সেই দেশতো আমাকে কখনও কবিতা নিয়ে বিশ্বের কাছে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেয়নি।
কবিতাটা আমাকে সবরকম নৃশংসতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সর্বদা তৈরি করে রাখে।

সবকিছু অসহ্য লাগছে আজকাল। তারপর সব তিতা হয়ে যায়।
কয়লার চেয়েও জীবনের স্বাদ তখন তিক্ত।

কেন আজকাল ঘুম কম, ঘুমের কাল। একা আমি বিনিদ্রতার শিকার।
এখন আমি সমস্ত রাত ঘুমাতে পারি না! শিশু কি প্রাপ্তবয়¯‹ কারও শত্রু হতে পারে? না একজন প্রাপ্তবয়¯‹ ব্যক্তি শত্রুতা করতে পারে শিশুর সঙ্গে?
নিজের নির্জনে, জনারণ্যে একা। ঘুম আসে না। দিনের শেষে, ঘুমের দেশে। সজাগ সারথী।
আমিও তো সচল অতিথি। স্বপ্ন কিছু আছে, মনে হয় খোদার কোনো নেক নজর আছে...
দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট আমার জীবনের ঊর্ধ্বমুখী স্বপ্ন রঙিন পাখা মেলবে।
ক্রমশ পাগল-পাগল লাগছে আমার... আমি এক বদনাম ফেরেস্তা। পবিত্র পাপী। দুশমন ইয়ার।

আমার বাহ্যিক রূপ জমকালো অনআকর্ষণীয়। জ্বরতপ্ত সভ্যতার শয্যায় পরিত্যাজ্য।
বিবমিষা নিয়ে আমি বেড়ে উঠি রোজ। অস্বস্তির সুঁচ বুকের ভিতর গিয়ে বিঁধে প্রতিদিন।

আমি একটি অপরূপ সুন্দর নগ্ন শিশু নই। মুখে আমার অপূর্ব মিষ্টি হাসি নেই।
চোখে হাসির ঝিলিক নেই। হাতে সুন্দর একটি তীরধনুক নেই।

আমি একজন 'কিউপিড্' নই। বিশ্রী লোমশ, বিশাল আমার চেহারা।
বিশাল চেহারার লোমশ কুৎসিতদর্শন এক শিশু।

আমি হাসিনি কোনোদিন। আমি কাঁদিনি কোনোদিন।
আমার মন লোহা দিয়ে তৈরি। আমার মন সীসা দিয়ে তৈরি।
আমি পাথর। আমার ব্যর্থতা কী পাথরকে জানাব?

জানি না আমি কিছুই জানি না কেন জানি না? কেন কিছুই জানি না আমি।

আমি জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি, তুমি যেন ঘৃণা করো না।
আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমাকে বাসো না।
তুমি যাকে ভালোবাসো সে তোমাকে বাসে না।

গেট লস্ট ফ্রম মাই লাইফ। মাই লাইফ উইথ জুঁইফুল চৌধুরী।
জুঁইফুল চৌধুরীই আমার জনক এবং জননী। বোথ্। (দ্বৈতসত্তা)।
আসলে জননীরই একটা রূপ জনক। কিংবা জনকের আর একটা রূপ জননী।
জনকের প্রকাশ ঘটত জননীর মধ্যে দিয়ে।

প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী। জননীকে আমি বিসর্জন দিতে রাজি নই পুরাপুরিভাবে।
জুঁইফুল চৌধুরী জনক আর জননী দুই-ই তাই তাঁর কদর অনেক বেশি।
বাংলাদেশ, জননী আমার। আমার বাংলাদেশ মহিয়সী।

পরিবর্ধিত

## দায়িত্ব

দায়িত্ব ভার বটে, কিন্তু তার সুস্বাদ আছে, মোহ আছে। মা মেয়ে ছেলে ভাই বউয়ের কোনো চাওয়া তখন মনে হয় আমি যেন এদের নির্ভরতার আকাশ।
বৃষ্টি হয়ে ঝরতে অথবা রৌদ্র হয়ে পাবন আনতে আমি পরম হর্ষ অনুভব করি।
মানুষের বোধহয় একটা মাধ্যাকর্ষণ আছে।

## অগ্নিতত্ত্ব

গুরু : যেখানেই আগুন পাবি সেখানেই বসে পড়বি। সেখান থেকে আর নড়বি না।
শুধু বিশ্বাস বিশ্বাস, জ্বলন্ত বিশ্বাস। আমরা জ্যোতির তনয়।
শিষ্য: সূর্য অস্তে গেছে, নেই চন্দ্রিমাও, এই ঘোর অন্ধকারে আমরা আলো কোথায় পাব?
গুরু : আগুন। আগুনই সেই আলোকশক্তি। ফায়ার। আগুন।
শিষ্য: যদি এই আগুনও মরে যায়, তাহলে আমরা আলো কোথায় পাব?
গুরু : সেই অন্ধকারে মানুষকে তার উপস্থিতি বুঝিয়ে দিতে হবে শব্দ দিয়ে।
শিষ্য: যদি শব্দও না থাকে?
গুরু : অন্তরাত্মাই তখন আলোকশলাকাদিশারি।

## নতুন কবি স্মরণে

আবিদ আজাদ চলে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই মুস্তফা আনোয়ার মারা গেল। পৃথিবী থেকে ভালোবাসার মানুষগুলি উবে গেল। পৃথিবীটা আমার কাছে বদ্ধ ডোবার মতো মনে হচ্ছিল। আর আমাকে এই বদ্ধ-ডোবায় ফেলে পালালে। তুমি ভীষণ স্বার্থপর। কাওয়ার্ড।
তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি, তুমি চলে গেলে বÇ তাড়াতাড়ি। সব খেলা ফেলে চলে যেতে হলো তোমাকে। গোরে মাতৃ-ক্রোড়ে।

তুমি আর কোথাও নেই! তুমি আর আমাকে দেখছ না! তুমি যতদূরে যাও তোমার জীবন হতে, তোমার ছায়া ততো লম্বা হয়ে ঘিরে থাকে আমাকে।

এই গ্রীন রোডের সংসারে আরও ক'দিন থেকে গেলে হতো। আর কয়েক দিন। আর একটু। আর ষাট মিনিট। উচ্ছ্বাস থেকে বিষণ্নতা এ বেলা, ও বেলা, এই দশ বেলায় বেলাবেলি তুমি সমস্ত উØগকে শুকনা পাতার মতো মাড়িয়ে চলে গেলে। এ যাওয়া মানে ফিরে আসা বারে বারে।

আর কয়েকটা দিন। মরা বিকেলের আলোয় তুমি চলে গেলে অনেক দূরে যেখানে লাইফে কোনো ডিস্টার্ব নেই...। তোমার প্রহর চলে গেছে। কোনো গভীর গুরুত্বপূর্ণ কবিতা এখন অর্থহীন। সকালে বারডেম থেকে বেরিয়ে আসে তোমার অ্যাম্বুলেÝ এরপর অ্যাম্বুলেÝ বাংলা একাডেমীর ভিতরে যায় যেখানে আমার কয়েকজন বন্ধু দাঁড়িয়েছিল রহস্যঘেরা বিচিন্তা-বিচ্ছিন্ন মন তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়েল। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নাও আজিমপুরের একটা সাধারণ কবরস্থানে চিরদিনের জন্যে। তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ ক্ষুধা তুচ্ছ শীত। আমরা সবাই হারিয়ে যাবো, শীতের রাতে কেউ জানে না। শস্যক্ষেতে জন্ম কবরে মৃত্যু জন্মমৃত্যুকে অনুভব করো তুমি সফল পরিক্রমায়। কবরে-ভবনে সর্বত্রই আসন। মারা যাবার পর আ্মা মাটির নিচ দিয়ে নানা চক্রে আকাশে মিশে অণু হয়। অণুটা ভাসছে, ভাসতে ভাসতে যেন শূন্যতার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অনন্তকালের দিকে। পরজন্মটন্ম মিথ্যা, তুমি মারা গেলে, মাথা কুটলেও কি তোমার দেখা পাব আমি, তবে হ্যাঁ, স্বপ্নে আসো, কিন্ত কী বিষণ্ন তোমার মুখখানি, কত লোক বেঁচে আছে, বসন্ত আসছে, বর্ষা, শীত আসছে, এসব তোমার ভোগের হলো না, বেঁচে থাকতে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়, অনেক মানুষের সঙ্গে বেঁচে থাকা, অনেক গন্ধ, অনেক স্পর্শ নিয়ে বেঁচে থাকা, তোমার পাশে এসব কিছুই নেই, কোথায় যে চলে গেছো তুমি। একা হয়ে অন্ধকার মহাশূন্যে ঘুরছো হয়তো। মানুষ মরলে কি হয় তা আমি জানি না। কেউ বলে আকাশের তারা। কিন্ত সেও তো একা। আমার ভয় ভয় করতে লাগল। হ্যাঁ, তুমি খুব একা, একা হয়ে ঘুরছো। তুমি এই পৃথিবী থেকে নিÕান্ত হয়েছিলে। আমিও এই নিÕমণ চাই।

ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো মৃত্যুকে বরণ করে ছাড়পত্র পেলে। তোমাকে কবর দিয়ে স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলি। মরে গিয়েও মনের গোপন কুঠুরিতে সযত্নে লুকিয়ে রাখা ক্ষতস্থানটা তুমি আবার খুঁচিয়ে দিয়ে গেলে। ওটা যে এত কাঁচা ছিল, এত রক্তপাত যে এখনও হতে পারে ওই ছোট্ট ক্ষতটা থেকে, তুমি মারা না গেলে হয়তো কোনওদিনই বুঝতে পারতাম না আমি। ইচ্ছে করলে আমিও যেতে পারি। আমি চলে যেতে পারি। ক্রুয়েল এই পৃথিবী ছেড়ে। কত বিজার্ড বয়ে গেছে জীবনে। আমি এমনিতেই খুব বেশিদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখতে পাবো বলে আমার মনে হয় না।

সকালে ঘুম ভেঙে আমি দেখবো, আমি শুয়ে আছি নিজের ঘরে আর দুঃস্বপ্নের ঘামে বালিশ ভিজে গিয়েছে। তোমার সমস্ত ঐতিহ্য আমার মাথায় দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে থাকে।

শরীরটা অচল হয়ে গিয়েছে, অথচ মনটা একইরকম আছে। ভিতরে অঝোরে পানি পড়ে, কিন্ত চোখ দিয়ে সে পানি বেরোয় না। এই সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, দিনরাত্রি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, জন্ম, শৈশব, বার্ধক্য, মৃত্যু, মৃত্যুর মতোই এক চিরন্তন বিচ্ছেদ।

তুমি নতুন কবিতা রচনা করেছো। নতুন ভাষ্য দিয়েছো। তুমি নতুন টীকা রচনা করেছো। তুমি নিজেই তোমার ইতিহাস রচনা করেছো। আমি সেই কবিতা টীকা ভাষ্য ইতিহাস পাঠ করছি কবিতানুক্রমিক জীচনচর্চায়। তোমার মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছি আমার আরাধ্য সব্যসাচীকে।

আসলে তুমি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলে। খানিকটা উঠে এসে এবং কিছুটা নেমে তুমি টিকে থাকতে চেয়েছিলে ভীষণ। তোমার চলে যেতে হবে সুনিশ্চিত, অথচ তুমি আরো কিছুটা নিতান্ত বাংলা সাহিত্য ভালবাসতে চেয়েছিলে।

মৃত্যুর পরপারে আর কোনোদিন যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় তাহলে বলবো তোমার সাহিত্য গ্রন্থ আমি বন্ধ করিনি আজও সেটা তেমনি খোলা আছে। তোমার অনুরণন বাংলাদেশের বুকে লেগে থাকবে অনন্তকাল। শরীরে নয় রঙ ছিল তোমার মনে। তুমি ছিলে এভারগ্রিন। বয়সের ভার তোমার মনকে স্পর্শ করতে পারেনি! হৃদয়ের সঙ্গে মিশেছিল তোমার বুদ্ধির অপরূপ চাতুর্য। তোমার বাক্‌নৈপুণ্য দিয়ে আমাদের আকৃষ্ট করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তোমার।

জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে ফারাক শুধু এক চুলের। তোমার পরিকল্পনাকে-উত্তেজনাকে এক নিঃশ্বাসে, এক প্রশ্বাসে, এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছিল মৃত্যু তোমার বুকে একগাদা ক্রোধ-অভিমান-নালিশ ও ব্যর্থতা নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছ। স্মৃতি হয়ে যেতে আর দেরি নেই। স্মরণ সময়ে নাও বেদনার ফুল স্মৃতিকাতর। আমার অন্ধকারের আলো তোমার স্মৃতি। নীল মাছির মতো উড়ন্ত কিছু স্মৃতি।

পরিবর্ধিত

## বাউন্ডুলে

আমি প্রজাপতির মতো বাউন্ডুলে, এক ফুল থেকে অন্য ফুলে ঘোরাঘুরি।
কারো মন একনিমেষে ভাঙতে পারি, আমি এমন একটা বাউন্ডুলে।

## পুষ্প প্রদশনী

পাড়াগাঁর নদীর ধারে বনের পাশ দিয়ে নীরবে হেঁটে যাচ্ছে কুয়াশা
শীতের পথে কুয়াশার জার্নি। স্মৃতির পথে সেন্টিমেন্টাল জার্নি।
সেইসব সোনাঝরা দিনে ফিরে যেতে যেতে নস্টালজিয়া হয়ে পড়ে কুয়াশা।

শীত প্রসব করে নিরাপদ ফুল আহা, মধু, মধু! তুলনাহীন ত্বক!
রঙের সঙ্গে সৌরভের মিলনেই ফুলের জন্ম হয়।
শোকের কোনো কারণ নেই! দম্পতি প্রফুল আছে!
ফুলটি পূর্ণ পস্ফুটিত হবার আগেই শীতের শিশিরে সিক্ত হয়ে গেল।
মৃদু ভুরভুরে ফুলের 'আজনবি' ঘ্রাণ শীতের বরকে শপথ নিতে হতো যে,
সে কখনো তার বউকে শিশির পান করা থেকে বঞ্চিত করবে না।

এক চামচ স্যাভলন এক বালতি পানিতে মিশিয়ে শীত গোসল করিয়ে দিচ্ছে ফুলের।
সকালের হালকা রোদে বাড়ির গোবরে নিকানো উঠানে বসে গামছা দিয়ে ফুলের শরীর মুছে দিচ্ছে শীত।
ফুলের সংসার সুখের হবে। পথ ফুলে ঢাকা থাকে না তা কাঁটায় বিছানো।
সংসার রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয়ের পালা শুরু করে সে। সেই কাঁটা মাড়িয়েই এগোতে হবে। থর্ন ডে-আউট।
ফুলের দিন হলো শুরু সুখের স্বর্গ বড় নিটোল হয় শীত সারা বাংলাদেশে পুষ্প প্রদর্শনীর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

শীত শিশিরকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দেয় এবং শিশিরের কানে কানে বলে দেয় যে
তোড়াটির ভিতর বোমা লুকানো আছে। ছদ্মবেশ ফুলেরও থাকে মানুষেরও থাকে
অবাঞ্চিত গন্ধ ফুল থেকে দূর হয়ে যাবে। ফুলগুলি থেকে প্রজাতান্ি• ক বীজ উত্তপ্ত হবে।

## দরিদ্র শালিখ

রেললাইনের পশ্চিমে খেজুর গাছ, রেললাইনের পূর্বে মাছের পুকুর,
গভীর নলক,প, পাম্প হাউজ, জলাধার এবং জলের কল।

একটা খেজুরগাছ। শীত তখন দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে শুরু করেছে।
খেজুর গাছের ওপর দিয়ে শীতের ছোট দুপুর গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে।
শাঁ শাঁ বাতাস খেজুর গাছের পাতায় পাতায় খরখর শব্দ তুলে বেজে যেতে লাগল।
গাছে একটা হাঁড়ি ঝুলছিল। হাঁড়ির পাশেই গাছের কিছুটা অংশ কাটা।
সেখানে মুখ আর ঠোঁট লাগিয়ে রস খাচ্ছিল একটা কাঠবিড়াল, একটা টিয়া আর একটা শালিখ।

কাল পাখিগুলি আসবে। ওরা রোজ আসে, দিনভর রস খায়।

সামনের ওই খেজুরগাছের হাঁড়ির মুখে দুটি কাঠবিড়াল।
তিনটা শালিখ আর একটা টিয়াপাখি গোল হয়ে ওপরে উড়ছে,
বোধহয় বসার জায়গা পাচ্ছে না ঠিকমতো।

টিয়াটা এইমাত্র বসে পড়ল গাছের ওপর। বসতেই কাঠবিড়াল জায়গা ছেড়ে সরে গেল কিছুটা।
সরে গিয়ে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দুটো হাত ঘষতে লাগল। তিন শালিখের এক শালিখ উধাও,
আজকের শালিখ অতি দরিদ্র শালিখ। আমি দরিদ্রের বন্ধু, আদর্শবাদী।
বাকি দুটো এখনো গোল হয়ে ঘুরছে হাঁড়ির উপর। কাঠবিড়াল, টিয়া আর শালিখের মধ্যে এখন ঝগড়া।
বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়, ঝগড়ার পর মনও তেমনি পরিষ্কার হয়ে যায় তো?

## ইরাকি বিপর্যয়

একটি নির্জন বাড়ি যার পিছনে উত্তাল সমুদ্র আর একটি লাইট হাউসের আলোর ইশারা। রাতটা ঝড়জলের। লোডশেডিং-এ সেই নির্জন বাড়িতে স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছে স্বামী ঝড় বৃষ্টির দাপট সামুদ্রিক উচ্ছ্বাস, থেকে থেকে লাইট হাউসের আলোর প্রবেশ, রেডিওতে ইরাকের মিলিটারি একনায়কত্বের অবসানের খবর। দূর থেকে গাড়ির হেডলাইট দেখা যায় বাড়ির সামনে গাড়িটি এসে থামে। ভীত সন্• স্ত এই মহিলা পিস্তল বার করে প্রহর গোণে গাড়ি থেকে নামে ওর স্বামী। মহিলা আশ্বস্ত হন, কিন্ত পৌঁছে দেওয়া আগন্তক ডাক্তারকে দেখে তার মনে সন্দেহের দানা বাঁধে গাড়ি চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে আবার গাড়ি নিয়ে ডাক্তার ফিরে আসে। এখানে এসে মনে হচ্ছে যেন আমি

শৈশবে ফিরে গেছি। সব এত মানানসই লাগছে যে কি বলব। শুধু একটা ব¯‘ এখানে বড় দৃষ্টিকটু লাগছে।

ঐ রেডিওটা। এ পরিবেশে ওটা যেন অন্য গ্রহের জীব লাগছে।

## স্বপ্ন

স্বপ্ন... স্বপ্ন...স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখে মন জনসমুদ্র, মধ্যবিত্ত অশ্রা, রক্তকিশুক মনের মধ্যে কামড় দেয়।

সোনালি লিরিকের মৃত্যু। বেগ তাড়না নয়, অভিঘাতী কামড়।

আছে রক্ত ও আগুন, লাল ত্রিকোণ। অন্ধকার, দহন। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু। আছে রক্তভেজা শার্ট, আছে জোনাকির আলোয় ঝিঁঝির কনসার্ট, আর আছে জলে ভেজা শাড়ি।

## গফুরের মহেশ

গফুরের মহেশ চলে যায় দীর্ঘতম মাঠের ঘাসকে মাড়িয়ে তথাপি এ জনারণ্যে শোনা যায় অরণ্যের ন্ধদস্পন্দন।

কল্পনা। কল্পনা। জাস্ট কল্পনা। আমি আমার কল্পনাটাকে টেকনোলজি দিয়ে ধরে রাখতে চাই।
তুমি আমাকে আর খুঁজো না। আমেনা। অপার করুণা! '... ভেবে দেখেছ কি, তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে...' আমাকে ডাকছে দূরের আকাশ। এই খাঁচাখানার দিন শেষ হয়ে এসেছে। একেবারে সৌর পরিবারের বাইরে চলে যাচ্ছি আমি আমি চলে যাচ্ছি লং ডিসটেন্স ট্র্যাভেলে। ইঞ্জিনের জোর আছে, ট্যাঙ্ক ভর্তি তেল আছে। আমি বুঝি আরও অনেক দূরের খবর পেয়ে গেছি। যেখানে মুক্ত বিহঙ্গ তারার সপ্তক পার হয়ে যায়। (সোনার পাখি?) (ইচ্ছাপাখি?) পাখি দেখলে হিংসা হয়... ওরা যে উড়তে পারে!

## বকুলের বকর-বকর

বৃষ্টির মতো কথা আসতে লাগল বকুলের মুখে অনুশাসন পর্ব এখন দেশে।
বকুল শুধু দেখতে পাচ্ছে অসন্তোষ ও ক্রোধ জমে বরফ হয়ে আছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে।
আইন এখন জীবিত নেই। এমন একটা শাসন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে যার প্রকৃত চেহারা

বকুল জানে না। প্রধানমন্•ী তো জানেন না'ই। সমাজের রঙ-করা মেকানিকেল মুখকে তিক্ত জীবন বাস্তবতার তুলিতে মলিন করে তুলেছে। ব্যবচ্ছেদব্যথার তীব্রতা অসহনীয় করে তুলেছে।
কিন্তু দেশের কঠোর অনুশাসনের সমস্ত পাহাড় নিষেধগুলি পেরিয়ে লোকতন্ে• র নিবিড় সান্নিধ্যে আসবার সব রকমের সুযোগ আর ফন্দি-ফিকিররই খুঁজে বেড়ায় বকুল।...
বকুল! প্রাত্যহিক ব¯‘ বিশ্বের নির্বাচিত দৃশ্য মিছিলের অংশীদার এই বকুল
বকুল আমার পরিচিতজন। অতি কাছের, আত্মার আত্মীয়ও বলা যেতে পারে।
বকুল যতটা ব্যক্ত করবে তার চেয়ে অনেক বেশি থাকা উচিৎ অব্যক্ত। এই অব্যক্তরই নাম জ্ঞান।
বকুল এখন সব দেখবে, কিছু বলবে না। ইস্, বকুল কেন কথা বলছে, অব্যক্ত পরিস্থিতি।
এখন তো কথা বন্ধ। বকুল আবার মুখর-ব্রত ভঙ্গ করে মূক-ব্রত গ্রহণ করবে।
বকুল সেই কথা সরাসরি বলে, কথা, কথার ভিতরে কথা, কথার প্রেক্ষিতে কথা,
কথার অন্দরে কথা, চারপাশে ওড়ে, অনেক প্রশ্ন, অনেক আলোচনা, অনেক কথা কাটাকাটি
এভাবেই যে কথা বলার নয়, বলা হয়ে যায় কথায় কথায় কথা বাড়ে, কথাকল্পদ্রুম।

মোদ্দা কথায় ফেরা যাক। ইচ্ছা করেই কথাকথন্তরের দিকে কথার নল চালাল বকুল। কথা কাটাকাটি হলো। পরস্পর পরস্পরকে কাটাকুটি করছে। বকুল প্রায় বাক্যহারা বকুলের বাকশক্তি হারিয়ে গেছে। বকুল এখন ছবি দেখে। বকুল এখন টকিং ডলের সঙ্গে কথা বলে।
শব্দের গতি কি দৃশ্যের গতির চাইতে কম? কে জানে? বিজ্ঞান জানে এমন কাউকে জিগগাস করতে হবে।
বিজ্ঞানের নিয়ম যেমন কঠোর সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার ব্যতিক্রমও তেমনি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়...

## কায়ানট

ছায়ালোকের অধিবাসীরা কায়া হয়ে পথে বেরিয়েছে। গাড়ির মতো রাস্তা নিয়েছে।
নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুলে কায়ার সঙ্গে দেখা হলো। কদমতলায়, ফরিদাবাদের বাকচরে।
হাইওয়ের পাশে আদমজি জুট মিলে। ডেমরায়। ক্যান্টনমেন্টের আদমজী কলেজে।
ক্ত২ নম্বর ধানলেকের উল্টোদিকে গার্লস স্কুলে। সূত্রাপুরে, যাত্রাবাড়িতে, জগন্নাথ কলেজে,
শাঁখারিবাজারে, বাংলা বাজারে, লালকুঠিতে সর্বত্র দেখছি আতঙ্কিত কায়া।
চোখে বিষাদ আর অনিশ্চয়তার ছায়া।

## হাঁসাড়া যা

হাঁসাড়া, ভেবেছিলি ডুবে ডুবে জল খাবি, শিবের বাবা টের পাবে না।
সেই যখন কুল মজালি, মিছে কেন লোক হাসালি।
‘চাল নাই চুলা নাই বিয়া করতে যায়’
যে হারটি গড়তে দিবে, বলেছিলে; তার কি? হলো!

স্রোতে ঘর ভেসে গেল, আবার নতুন ঘর বাঁধতে হবে;
কাঠ কাটতে হবে, দেওয়াল গাঁথতে হবে!

ষোলোঘর আঠারোবাড়ি। অনাহারী থাকে খানাবাড়ি।
বাড়ি যা। ঘরটা বহুকাল সারান হয়নি, সারাতে হবে।
ইঁদারাতলা বাঁধা দরকার। গোয়ালঘরটা বেশ ছোট, বাড়াতে হবে।
একটা গাই দরকার। গাই আন। হাঁসাড়া, বাড়ি যা। গেলেই কথা হবে।

ট্রাকটরের পাশে কাস্তেটা নামিয়ে রেখে, বাড়ি যা।
পা চালা জোরে, সন্ধ্যা হলো বলে।

## এ জেনারেশন

আমি আমার কবি বন্ধু ধান নেওয়াজকে টেনে বারান্দায় এনে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললাম,
এ জেনারেশনের লোকগুলি সাদাসিধা ভেবেছিলাম । সাদাসিধা! ব্যাটারা এক নম্বরের চোর, পাক্কা ক্রিমিনাল। ডেঞ্জারাস! মিনমিনে স্বভাব, মিষ্টি-মিষ্টি কথার লোকগুলি মহা হারামি হয়।
গর্বিত, উদ্ধত, প্রলুব্ধ, নিষ্ঠুর, স্বার্থান্ধ। মনে রাখতে হবে এ জেনারেশন জন্মাবধি এক পরমুখাপেক্ষী।
এ জেনারেশনকে দেখছিলাম চতুর্দিকে। জঘন্য। অনাসৃষ্টি। চরিত্রহীন। এ জেনারেশন।
ওরা পুকুরের কচুরিপানার মতো, যত জল নেড়ে সরিয়ে দেওয়া হোক মুহূর্তে যে-কে সেই!

হাঁড়ির মধ্যে জীয়ান মাছ, পরস্পর অঙ্গস্পর্শে কণ্ডুয়নে আর কিলবিল করে দিন কাটাতে চায়
এ জেনারেশনের সময় তো দিনের মুখে বাথরুমের আলোচনার মতোই অশ্রাব্য।
এ জেনারেশন অন্তর্মুখী। যাকে পছন্দ হয় শুধু তার সঙ্গে কথা বলে।
অল্প কথা বলে। কিন্ত প্রত্যেকটা মেপে মেপে   পুকুরের জলে একটা করে ঢিল ফেলার মতো।
ওরা চলে অনেকটা আকস্মিকতার তোড়ে, হুজুগে; হঠকারী ঘটনার হাওয়ায়।
ওদের সঙ্গে মাঝে মাঝে খুব সাধারণ দু-চারটা কথা হয় আমার
বেশির ভাগ কথা মাটির দিকে চোখ রেখে নিচু গলায় বলি।

যার কোনো প্রয়োজন বা মানে নেই। যতটা পারি অ্যাভয়েড করে চলি।
আমি নীরব হয়ে গিয়েছিলাম ওদের কাছে। অন্তত ক্রমশ হতে চেষ্টা করেছিলাম।
যারা নিজেদের পরিচয় গোপন করে অন্যর সম্বন্ধে খারাপ কথা বলে তাদের আমি ইমপর্টেÝ দিই না। চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে পরখ না করেই তার পিছনে দৌড়াই না।
আমি তাদের ওয়েল-উইশার নই।
আমার প্রশ্ন করার বাসনা নেই, অধিকার নেই।
প্রশ্ন কেন করব। তাছাড়া দুরূহ প্রশ্নে যাবার প্রয়োজন কী?
উল্টর পাওয়ার বেশি আর কী পাবো? সব রহস্য ভেদ করে কী লাভ হবে।
জীবনটাই যখন কড়া আলোর নিচে নগ্ন, থাকুক না একটু না-জানা কিছু।

কলাবাগানের ধানলেকের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধান নেওয়াজ ভাবছে বুঝি তার পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির কথা।
হায়রে! এ জেনারেশন। বাঁধ ভাঙা বন্যায় অ্যান্টি হিরো করে দিতে চাও জগৎটাকেই।

## বাবা

রাতুলের বয়স ক্ত২ বছর, রাতুলের বাবার বয়স ৬ক্ত বছর। বাবা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, প্রচুর পড়াশোনা করেন, নানা বিষয়ে ওঁর অনেক জ্ঞান।
বরাবর উনি হ্যাপি গো লাকি গোছের, সবাইকে যে কোনও কাজে খুব সাহায্যও করতেন সব সময়ে।
বাড়ির নানা কাজ, বিশেষত বাজারের দায়িত্বটা ওঁর ওপর দিয়ে অনেকদিন খুব নিশ্চন্তে ছিল রাতুল। রাতুলের দুটা বাচ্চার দেখাশোনা, তাদের পার্কে খেলতে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজগুলিও উনিই করেছেন বরাবর।
দুবছর আগে হঠাৎ করেই হার্ট অ্যাটাকে মারা যান রাতুলের মা। তারপর থেকেই বাবা বদলে যাচ্ছেন। সারাদিন বাড়ির একটা কোণে চুপ করে বসে থাকেন এখন। বাজার করতে গেলে অর্ধেক জিনিসের কথাই ভুলে যান। কিছুদিন আগেই বাচ্চাদের পার্কে খেলতে নিয়ে গিয়ে ওদের ফেরত আনতেও ভুলে গিয়েছিলেন। পুলিশে খবর দেওয়ার পর দেখা গেল বা”চারা পার্কে বসে, উনি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাস্তায়।
কিন্ত গত মাস দুয়েক হলো উনি নাম মনে রাখতে পারছেন না, তারিখ-টারিখও ভুলে যাচ্ছেন, সব সময়ই কনফিউজড মনে হয়। প্রথমদিকে ওরকম ছোটখাট ব্যাপার হলেও কয়েক দিন আগে বেশ বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বাবা ফেরেনি। রাতুল চিন্তায় ছটফট করছে। এমন সময় এক প্রতিবেশির কাছে খবর পেলাম যে উনি পার্কে আছেন। সারাদিন গোসল-খাওয়া-দাওয়া কিছু করেননি, ওখানেই একটা চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিয়েছেন। রাতুল শুনেছে নাকি শেষ বয়সে রাতুলের দাদারও এমনটা বেখেয়ালে হয়ে গিয়েছিলেন।

## স্মৃতিসভা

কার যেন সংবর্ধনা? সংবর্ধনা? না না স্মৃতিসভা। স্মৃতিসভা? কার? কবি কুসুমকুমারী দেবীর ছেলে জীবনানন্দ... হ্যাঁ হ্যাঁ। হোয়াট ওয়াজ হি? দেশকর্মী? বিপ্লবী? আর্মি? ডায়েড ফর এ কজ? কারুকে বাঁচাতেটাচাতে গিয়ে? না। কুসুমকুমারীর ছোট ছেলে জীবনানন্দ ওয়াজ এ হাইলি প্রোমিজিং পোয়েট। ও; কবি! ওয়াজ হি পাবলিশ্‌ড? সিগনেট প্রেস ওর একখানা বই ছাপিয়েছিল। খুব ভালো লিখত। বড় বড় লোকের সার্টিফিকেট আছে। হাউ, হাউ, হাউ ডিড হি ডাই? ট্রাম চাপা পড়ে... হাউ ড্রেডফুল! জীবনানন্দ কবিতা লিখত। ভালোবাসার কবিতা। বরিশালের শিশু আউস ক্ষেতের মতো অহিংস সবুজ চেহারা ছিল তাঁর। তেরো বছর বয়সেই নির্ভুল বাংলা আর ইংরেজি লিখত।

একটা পশুর মতো হিংস্র, সতেজ ও ক্ষুধিত সন্ধ্যা। সে হঠাৎ সন্ধ্যার রাস্তায় বেরিয়ে ট্রামে চাপা পড়ে মরে গেল। যন্ত্র রাক্ষসই হত্যা করল জীবনানন্দকে, ট্রামের চাকা তাঁর হৃদয়ের স্বরকে টুঁটি টিপে মারল। জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু যুগচণ্ডালের কাছে তান্ত্রিক সভ্যতার প্রথম বলি। কয়েক দশক হয়ে গেছে তাঁর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু মনে হয়, এখনও তাঁর কবিতার রক্ত স্বর্ণসভ্যতার যূপকাষ্ঠে দানা বাঁধেনি।

জীবনানন্দ মুক্তি চাইছে। এবার ও আবার বেরিয়ে যেতে চায়, শেষ করে দিতে চায় নিজের কিশোর ও অপূর্ণ অস্তিত্বকে কোন এক চিন্তাহীন, হৃদয়হীন ট্রামের চাকার নিচে। কিন্ত আর জীবনানন্দ ফিরতে চায় না কোন অর্থহীন স্মৃতিসভার প্রহসনে।

আর আমার স্মৃতিসভা করবে না মা, কোন মানে হয় না। আলো-আছড়ানো চশমার পরকলার দুপাশ থেকে দুটো তীক্ষ্ণ চোখ জ্বলে উঠলো কুসুমকুমারী দাশের, তাই হবে। সেই জীবনানন্দের মা বললেন, তাই হবে মিলু। জীবনানন্দের ডাকনাম ছিল মিলু। (এইটাই তাঁর মা'র দেয়া নাম) বলতে গেলে, জীবনানন্দের কবিতার গুরু তাঁর মা-ই।

## আগুনের তলোয়ার

চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি, জমিতে লাল হলদে মেশানো বুটি;
আরও একটু কড়া লাল রঙের বাউজ, কপালে বড় লাল টিপ।
লম্বা চুলের গোড়ায় লাল রেশমী ফিতা।

তোমার শরীরের ফে৷৷মে অমর যৌবন কোমর বেঁধে বসে আছে।

তোমাকে দেখে অনায়াসে বলা চলে পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকনম্র সঞ্চারিণী পলবিনী লতা।
মনে হয় তুমি আগুনের এক তলোয়ার

## স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

তখন ওরা এম, এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সাথী ও মধুমিতা। দুজনেই সহপাঠী এবং প্রাণের বন্ধু। মধুমিতা ছিল সুন্দর বিদূষী এবং চট্টগ্রামের এক খ্যাতনামা ডাক্তারের একমাত্র কন্যা। ঢাকায় এক আত্মীয়বাড়ি থেকে পড়াশুনা করে।
তারপর একদিন হঠাৎ এক অনুষ্ঠানে এক তরুণ সুদর্শন ইঞ্জিনিয়ার রঞ্জনের সাথে সাথী ও মধুমিতার আলাপ হয়। দিনে দিনে আলাপ ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়। তারপর দুজনেই অনেক এগিয়ে গিয়েছে। দুজনেই ভালবেসে ফেলেছে রঞ্জনকে। কিন্তু ক্রমশই রূপ গুণ যোগ্যতায় মধুমিতার থেকে সাথী পিছিয়ে যেতে থাকলো। সাথীকে জিততে হলে মধুমিতাকে হারাতে হবে, এই ভাবনা সাথীকে দিনে দিনে পাগল করে তুলল। শেষে একদিন আর থাকতে না পেরে মধুমিতাকে সাথী জানাল, রঞ্জনকে ছাড়া সে বাঁচবে না। শুনে পড়ন্তবেলায় যেন আধার নেমে এল মধুমিতার মুখে।

এরপর কদিন অসুস্থতার কারণে মধুমিতা ক্লাসে এলো না। তারপর একদিন গোধূলিবেলায় বিষাদনীল শাড়ি পরে এলো সাথী ও রঞ্জনের কাছ থেকে বিদায় নিতে। জানাল ওর বাবা হঠাৎ করে ওর বিয়ে ঠিক করাতে ওকে চট্টগ্রামে চলে যেতে হচ্ছে। কথাটা শোনার পর সেদিন রঞ্জনের মুখেও কালমেঘের ছায়া দেখেছিল সাথী। আর সাথী উপলব্ধি করেছিল এ এক বিরাট স্বার্থত্যাগ।

তারপর মধুমিতা সাথী ও রঞ্জনের সাথে আর যোগাযোগ রাখেনি। বিয়ের কোনো কার্ডও পাঠায়নি। যোগাযোগের চেষ্টা করেও নিরাশ হয়েছে সাথী। একযুগ বাদ মধুমিতার এক আত্মীয়র সাথে হঠাৎ দেখা। সাথী জানল মধুমিতা আজও অবিবাহিতা এবং এক নামী কলেজের অধ্যাপিকা কিন্তু সাথী জানাতে পারল না যে মধুমিতাকে ভালোবেসে রঞ্জন আজও একাকিত্বের জীবন বয়ে বেড়াচ্ছে।

## রাত্রির ট্রেন

একটি রিজার্ভ কামরায় অচেনা দুটি জীবনের জিজ্ঞাসা। পরিচয় হল তাদের। কিন্তু ঐ মেয়েটিকে ভালোবাসে একটি ছেলে। প্রত্যেক স্টেশনে দেখা করে সে পেতে চায় আরও কাছে। মেয়েটি চায় না। হঠাৎ ট্রেন থেমে যায়। পুলিশ হানা দেয় প্রতি কামরায়। একজন হত্যাকারীকে ধরতে। শেষ পর্যন্ত রিজার্ভ কামরা থেকে ছেলেটিকে বন্দী করে। কিন্তু আসল খুনীকে আবিষ্কার করলো সেই মেয়েটি যার কাছ থেকে ট্রেনের টিকিটটি সংগ্রহ করেছিল। পুলিশ খুঁজতে থাকে খুনীকে। সারা ট্রেন তোলপাড় হল। হঠাৎ চেন টানায় গাড়ি থামলো। খুনী পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ট্রেনের যাত্রীরাই

খুনীকে ধরে ফেললো এক উন্মুক্ত অন্ধকারের খোলা মাঠে। সামনে মৃত্যু জেনে খুনীর বাঁচার কি আগ্রহ। মুক্তি পেল সেই ছেলেটি যাকে ভুল করে পুলিশ ধরেছিল। মেয়েটি ভালোবাসতে চায়। কিন্ত ছেলেটি বিবাহিত। পরের স্টেশনে ছেলেটির জন্য তার স্ত্রী অপেক্ষা করছে। ওদিকে অন্য কামরায় সেই ছেলেটি যে এই মেয়েটিকে সত্যিই ভালোবাসে, সে দেখলো মেয়েটি একা নয়। সে স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল। ট্রেন ছেড়ে দিল। তারপরের স্টেশনে ছেলেটি স্ত্রীর সঙ্গে চলে গেল। সকলেই নামল। মেয়েটি সমুদ্রের তীর ঘেঁষে চললো একা। দিগন্তে। মহা জীবনের শূন্যতার মাঝে সে এক অপরিচিতা।

## সংক্ষেপে আক্ষেপ

নিউ টাউনের যে-ই অবিশ্বাস করুক না কেন, অবিশ্বাস হলেও সত্য।
এ কথা স্বীকার করতেই হবে। লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোশ্চেন। দুপাড় মলে মলে একাকার।
কিশোর প্রামাণিকের পুকুর সাক্ষী; ডেথ অ্যান্ড দি নরসুন্দা।
নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিন্যস্ত গোটা আকাশটা পুকুরের জলে। পুকুরের জলে নক্ষত্র জ্বলতো অজস্র।
হারিয়ে গেছে আমার স্বাপ্নিক কৈশোরের নরসুন্দা। আমার বাপের বাড়ির দেশ কিশোরগঞ্জ।
পুকুরের জলে প্রতিবিম্ব পড়ত কিশোর প্রামাণিকের।
নরসুন্দা বিধ্বস্ত ধ্বংসাবশেষ জলটুঙ্গির সহোদর। কিশোরগঞ্জের গভর্নমেন্ট ফার্ম,
খু-ব-ই হার্ম। কিশোরগঞ্জের দৈত্য-দানব,
সাবমেরিন অতিমানব। রাজনীতি, ভোট, গণতন্• , কিংবা উলটাদিকে রাজতন্• ,
স্বেচ্ছাতন্•  এক কথায় রাষ্ট্রীয় ফার্মগুলি একেকটা ইঁদুরমারা কলের মতো।
মানুষের মুখোশ পরাভ,ত প্রেত-জীন। চোখে আগুন নিয়ে দাঁড়িয়ে আগুন তোলে।
বেরলেই খপ করে খাঁচা বন্দি। এগুলির কাছে কচুরিপানা চিরদিন অসহায়।
আমি কচুরিপানার হিতাকা• ক্ষী। রাজতন্•  যতই উন্নত হউক, কচুরিপানার
অবস্থা নিতান্ত অবনত হলে সে কখনোই আপনাকে স্রোতে ধারণ করে রাখতে পারে না।
কারণ কচুরিপানার Øারাই নদী চলে থাকে। (চুপে চুপে বলে রাখি আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকি। গেরিলা ছন্দে গ্রাম দিয়ে শহর ঢাকি।) আমি বড় স্পর্শকাতর আর নরম স্বভাবের মানুষ।
আমি কোনোদিন কাউকে আঘাত করি না, আঘাত সইতেও পারি না।
আমিও এক নিঃসঙ্গ পথিক। আমার পথ চলাই বেদনা, তাই কেউ সঙ্গী হতে পারে না আমার।
জিলুর রহমান তিনি আজ আমাদের প্রেসিডেন্ট। সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আমাদের এল.জি.আর.ডি. মন্•ী।
আবদুল হামিদ তিনি আজ আমাদের স্পিকার। (স্পিকার আমার ইমাম)।
জিলুর-আশরাফ-হামিদ ভাই ভাই। কিন্ত তিন ভাইদের ব্যবহার কি সত্য সত্যই ভাইয়ের মতো?
সৎ ভাইয়ের মতো নয় কি? তাদের কাছে চাওয়াটা হয়তো সত্য কিন্ত আমাদের কাছে দেওয়াটা?

মিথ্যা।
এখন যে বড় দুঃখ এখন যে মৃত প্রতিশ্রুতি।

কিশোরগঞ্জজন্ত জন্তর পেটের ভিতরে থাকে নিউ টাউন, শোলাকিয়া,
একরামপুর, বত্রিশ, পুরান থানা, আখড়া বাজার, গাইটাল।

চিত্রকল্যাণী
সর্বজনপ্রিয়া নায়িকা জয়া আহসান-কে
Òরূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি Øিষো জহিÓ

রূপাঞ্জলি, তোমাকে সহস্রের মধ্যেও চোখে পড়ে, তোমার মুখ পলকে মনে মুদ্রিত হয়ে যায়।
চিত্রাঞ্জলি, তুমি সেই প্রথম বৃষ্টিপড়া আষাঢ়ের সকালের মতন সুন্দর।
তুমি সেই মাঘী সন্ধ্যার মতন সুন্দর। তুমি সেই বৈশাখী পূর্ণিমার রাতের মতন সুন্দর।
খুবই সুন্দর তুমি গায়ের রঙ যেন আশ্বিনের রৌদ্র ঝলকের কথা মনে করিয়ে দেয়।
শরতের সোনালি রোদের মতো তোমার মিষ্টিহাসি।
চিত্রের চরণে উৎসর্গীকৃত পুষ্পের মতো সারাজীবন তোমাকে থাকতে হবে পবিত্র নির্মল।
তোমার জীবন ধ্রুব নক্ষত্রের মতো শুভ্র সুন্দর আর স্থির অচঞ্চল হোক।
অপবিত্রের সান্নিধ্যে নিজে বড় বেশি কলুষিত হয়ে গেছি।
সন্ধ্যাতারার মতো তোমার নির্জন চোখের আলোয় গোসল করে মলিন অতীতকে মুছে ফেলব।
তোমার চিত্রমন্দিরের রাজকুমার আমি। তুমি আমার জীবনসর্বানী। তুমি আমার হৃৎপিণ্ডেশ্বরী।
তোমার সৌন্দর্য আমাকে দহন করে। তোমার শাণিত জিহ্বা আমাকে করে ক্ষতবিক্ষত।
মিলনের তীব্র সুধা পান করেছিলাম সেদিন! আমার পেয়ালায় মুখের দীপ্ত ছবি সেদিন ফুটে উঠেছিল।
নরম, পাতলা, গোলাপী-পাপড়ি ঠোঁট। ঠোঁটের লাল তথা ওষ্ঠ-লিপিকা। তোমার সৌন্দর্য আমাকে
‘মোর প্রিয়া এসো রাণী দেব খোঁপায় তারার ফুল।’
‘আমার গানের সব সুর দিয়া তোমার বাসর রচিব গো প্রিয়া।’
আমার বড় সাধ, তোমায় লাইলী প্রেম শেখাই।
আমি তোমায় দেখব যেন লাইলী, আর তুমি আমায় দেখবে যেন মজনু।

তোমার সৌন্দর্য আমাকে দহন করে। তোমার শাণিত জিহ্বা আমাকে করে ক্ষতবিক্ষত
অনিশ্চয়তায় আমি যত দুর্বল হচ্ছি তুমি তত সুন্দর হয়ে উঠছ।
তোমার অমন রূপ। আশ্রিত ঈশ্বরীর রূপ। দেখি নাই, দেখি নাই, তোমার অমন রূপ দেখি নাই...

ভালোবাসি যাকে, রূপের দেখি তাকে। আমি চোখ দিয়ে দেখি না, দেখি, হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে।
তুমি যত সুন্দর হয়ে উঠছ বিরহ আশঙ্কা আমায় তত গ্রাস করছে।
আঘাতে আঘাতে আমি যত মুষড়ে পড়ছি তুমি তত বেশি আক্রমণে উৎসাহ পাচ্ছ।
আমার বুকে যে যন্• ণা অনর্গল ধাক্কা মারে তুমি তার অংশীদার হতে যাবে কেন!
যার জন্য আমার চোখে জল তার জ্যোৎøা হতে বাধা কোথায়।
পরাজয়ের যন্• ণায় স্থির থাকতে শিখেছে যে হৃদয় তার জন্যেই অপেক্ষা করছে জয়ের চরম আনন্দ। জয়াঞ্জলি, 'জয় হবে দীর্ঘশ্বাসে'।

## ব্যাকমেইলিং

কোনো একটি মেয়ে বিয়ের আগে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম-ফেমে করেছে, এখন সেই মেয়েটির বাপ-মা তাকে ধরে-বেঁধে বেশ ধনীর ঘরে বিয়ে দিয়েছে, মেয়েটিও শাড়ি গাড়ি গয়নার স্ত‚পে ডুবে গিয়ে বেশ সুখেই আছে। হঠাৎ একদিন সেই প্রাক্তন প্রেমিক এসে হাজির হলো, মেয়েটির স্বামীর কাছে সব কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখাল। মেয়েটি ভয় পেয়ে টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করল। ছেলেটি আবার এল, আবারও টাকা আদায় করল। তারপর আবার, আবার-আবার। এইভাবে মেয়েটির জীবন জর্জরিত করে দিল।

## সত্য ও মিথ্যা

প্রথম উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠা

আমার বন্ধু সত্যকে সত্যই দেখতে সুন্দর। আর সুন্দর বলে সত্যর সত্যই এক বন্ধু আছে এবং তাদের বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় যে, তাদের পৃথক সত্তা বলতে কিছু নেই একাত্মা হয়ে গেছে।

ধানলেকের ধারে বসে আছে সত্য ও সীমা প্রেমিক ও প্রেমিকারা। পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎøার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে লেকের জলে। উপরের সীমাহীন আকাশ প্রেমের মতই সীমাহীন। কিন্তু সত্য চায় না সীমাহীন হয়ে থাকতে। বলে, 'সীমা'। চাঁদ সাক্ষী, আকাশ সাক্ষী, জল সাক্ষী, প্রকৃতি সাক্ষী আর তুমিও সাক্ষী আমি তোমায় ভালোবাসি। আমাকে ওরা দেখতে পায়নি আমি বললাম (অবশ্য মনে মনে) আমিও সাক্ষী সত্য।
'জানি সত্য যে তুমি মিথ্যা কথাই বলছো তবুও তুমি মিথ্যা করেই বলো যে তুমি আমায় ভালোবাসে। ঐ মিথ্যাকে আমি সত্য বলে মেনে না নিলেও ঐ মিথ্যার স্বাদকে গ্রহণ করব ভাববো আমার সত্য যদি সত্য তবে ঐ মিথ্যাও হোক সত্য আমার নিজের বলতে তো কিছু নেই সত্য আমি হয়ে গেছি তুমি তবে মিথ্যা কেন হয়ে যাবে না সত্য? আমার সত্য। তাই বলছি তুমি মিথ্যা করেই

বল যে তুমি আমায় ভালোবাস' সীমার স্বরে ভালোবাসার আকুল মিনতি।
অবাক হয়ে সত্য বলে 'বেশ। তোমার কাছে আমার সত্য যদি'... বাধা দিয়ে বলে উঠে সীমা 'তোমার সত্য কি সত্য? বল আমার সত্য'। সত্য বুঝতে পারে না, জবাব দেয়, বেশ তোমার সত্য যদি'... থেমে যায়, পুনরায় বলে 'কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সীমা তুমি ভুল করছো। আমি বলছি যে আমার সত্য' মানে সত্য কথা যদি মিথ্যা বলে ধর তাহলে তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করছো। মানে আমি মিথ্যাবাদী, আমার বাবা মিথ্যাবাদী, আমার দাদা মিথ্যাবাদী অর্থাৎ আমার বংশ মিথ্যাবাদী। আশ্চর্য সীমা তুমি এত বড় মিথ্যা কথা বললে কি করে!' রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠে সত্য। বিব্রত বোধ করে সীমা কাতর কণ্ঠে বলে 'কেন তুমি মিথ্যা মিথ্যা কথা ভেবে মিথ্যা মনকে মিথ্যা কষ্ট দিচ্ছ। আমি তো তোমায় তা বলিনি আমি বলছিলাম তোতাপাখির মতো একই কথার পুনরুক্তি করে সীমা...' তুমি মিথ্যা করেই বল...'।
উপায়ন্তর না দেখে সত্য বলে বেশ! আমার সত্য কথাকে যদি সত্য সত্যই সত্য বলে না মনে কর যদি সত্যকে অস্বীকার কর তাহলে আমাকেও অস্বীকার করছো 'কারণ আমিও যে সত্য। কেন সীমা আমার এই সত্য কথাটা তোমার কাছে সত্য লাগছে না কেন তুমি সত্য বলে মানতে পারছ না যখন তোমায় আমি সত্য করে বলছি যে আমি তোমায় সত্য সত্যই ভালোবাসি।
কথার গোলকধাঁধায় দুজনে ফিরে আসে একই জায়গায়। মনে হলো সামনে যেন একরাশ ধোঁয়া উঠেছে আর ঐ ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে দুটি অস্পষ্ট মূর্তি। ওরা সত্য কি না জানবার জন্য বললাম'কে তোমরা ধোঁয়ার সৃষ্টি করছো'... আমার কণ্ঠস্বরে তাদের চমক ভাঙলো। ভয়ে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো।বুঝলাম ধোঁয়াটা মিথ্যা প্রেমই সত্য।উঠে পড়লাম
বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। পিছন ফিরে চাইতে দেখি সীমা বলছে দেখ ভালোবাসা আমাদের নিবিড় বন্ধনে বেঁধেছি এবার সত্য করে বল যে তুমি আমায় ভালোবাস।' ভাবলাম বিপদ বুঝি ঘনিয়ে এলো, সংকট আসন্ন ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

## ব্ল্যাকমেইলিং

কোনো একটি মেয়ে বিয়ের আগে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম-ফেৎম করেছে, এখন সেই মেয়েটির বাপ-মা তাকে ধরে-বেঁধে বেশ ধনীর ঘরে বিয়ে দিয়েছে, মেয়েটিও শাড়ি গাড়ি গয়নার স্ত,পে ডুবে গিয়ে বেশ সুখেই আছে। হঠাৎ একদিন সেই প্রাক্তন প্রেমিক এসে হাজির হলো, মেয়েটির স্বামীর কাছে সব কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখাল। মেয়েটি ভয় পেয়ে টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করল। ছেলেটি আবার এল, আবারও টাকা আদায় করল। তারপর আবার, আবার-আবার। এইভাবে মেয়েটির জীবন জর্জরিত করে দিল।

## সারা জীবন

বাড়ির কাছেই নদী। নদীর পাড়ে বেড়াতে গেলাম বিকালবেলা। এই নদীতে নৌকা নেই, মাঝি নেই। আঁকাবাঁকা স্রোত আস্তে আস্তে বয়ে যাচ্ছে বালুর চর ছুঁয়ে। নদী পাড়ে কাশবন।

দু-একটা পাখি উড়ে আসছে। একটু আগেই এক যুবক কাশবনের পাশে লালমাটির রাস্তা দিয়ে ওর গ্রামের দিকে চলে গেছে। পোষা কুকুরটি ছিল ওর পিছনে।

আমাদের বাজারের মাছঅলাদের বসার জায়গা বটতলায়। তাদের পায়ের নিচে সিমেন্ট ঢালাই ঢাকনার আড়ালে বড় নর্দমা। পিছনে ফাঁকা জমির ভিতর নিমগাছ একটা। বড় বড় সবুজ গাছ চোখকে তৃপ্তি দেয়।

জীবনতো পদ্মপাতায় জল। সদাই থাকা না থাকার মধ্যে টলটল করছে। গড়িয়ে গেলেই হয়ে গেল।

এই জীবন নিয়ে কী করব? এই জীবন আমি চাইনি। তবুও এই জীবনই আমার হল। ফুল কি ফোটার আগে জানে কোন পোকায় তাকে কাটবে? কেমন করে, কোন সময় সে ঝরে পড়বে? এখনতো আমার ঝরে পড়ার বেলা। বড় করুণ এই সময়টা।

সামনে নদী সময়ের ময়লা একটুও না মেখে দিব্যি বয়ে যেতে থাকে। সামনে নদী, সামনে আকাশ, সামনে জাহাজ নৌকা আর মেঘ। সারা জীবনকে যেন একসঙ্গে দেখছি।

## সমুদ্রে নুনের পুতুল

চারিদিকে নোনাজল, ফেনিল সমুদ্রে উতরোল পাল শুধু গন্ধ ছাড়ে অন্য এক ঝড়ের নুনের। আমি সমুদ্রে নুনের পুতুল। আমার ত্বক থেকে এখনও নোনা গন্ধ যায়নি, আমার রোমে রোমে এখনও বিস্ময়ের বিদ্রোহের পাবন, কানে প্রচণ্ড সমুদ্র গর্জন। এই গর্জমান ক্রমউদীয়মান সমুদ্র আমাকে গ্রাস করে নেবে বুঝি... সমুদ্রের ঢেউ বেতারে শুনি একটি নদী দুটি ধারায় বিষ অমৃত কলধ্বনি। জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাবাগান আকুল করে। ওরে ডাকে আমায় পথের সেই ধ্বনিতে এখন বিজনপথে করে না কেউ যাওয়া-আসা।

সমুদ্রের গভীরে রয়েছে এক বিস্ময়কর উত্তাপ সেখানে তেল গ্যাস আমি সমুদ্রের মতো হতে পারিনি

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে তা বিদেশি ভাষার আঘাত পেয়ে মুক্ত হবে কারণ, আজ পৃথিবীতে তার কাজ এসেছে।

সমুদ্রের গভীরে রয়েছে এক বিস্ময়কর উত্তাপ আমি সমুদ্রের মতো হতে পারিনি...

আমরা সকলে জানি এসব কখনো চিরদিনের নয় তবুও সমুদ্রের কাছে গিয়ে দেখে নেব আমাদের

শক্তি। যে নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে গেছে তারও ছায়া সমুদ্রের উপরে। সমুদ্রের শরীর থেকে উঠে আসে ব্যথিত অয়েল, গ্যাস। চোখের জল ফেলতে চাইছি সমুদ্রে সমুদ্রের গভীরে সমুদ্র। হয়তো গভীরতর কোনো সমুদ্র আছে সমুদ্রের ভিতরে।

## ফ্ল্যাপ

আশি দশক থেকে রিফাত চৌধুরীর নাম বাংলাদেশের কবিতা-ভুবনে উচ্চারিত হতে থাকে। অনেকে তা করেন বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই। সত্তর দশকের প্রধান কবিরা তখন যার যার স্বতন্ত্র পথ পেয়ে গেছেন। এর পরে যে সাময়িক শূন্যতা দেখা গেলো, তা অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবেই ভরাট হয়ে যায় আশি দশকের একদল নতুন এবং সতেজ কবির আবির্ভাবে। এদের মধ্যে রিফাত চৌধুরী ও কাজল শাহনেওয়াজ অন্যতম। দু'জনই তখন ছিলেন লিটল ম্যাগ-গ্রস্ত কবি।

ধুলো-কাদা-ঘাম ও রক্তমাংসের বাস্তবের সঙ্গে মনোগ্রাহী রূপক ও চিত্রকল্প, যাকে আমরা ইদানীং বলি ইমেজ, এবং আত্মজৈবনিক উক্তির মিশেলে রিফাত চৌধুরী শুরু থেকেই তাঁর নিজস্ব ডিকশন আয়ত্ত করেন। পাঠক ও সমালোচকদের চোখে তিনি অল্পদিনে হয়ে ওঠেন আমাদের কবিতার এক নবীন মুখপাত্র। আমরা আবিষ্কার করলাম রিফাতের কবিসত্তার শিকড় তাঁর চেতনা-অবচেতনা এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তব-বীক্ষণের বহুদূর পর্যন্ত প্রোথিত। ব্যক্তিগত জীবনে বিশুদ্ধ ব্রাত্য ও বাউল এবং নিভৃতচারী, এই কবির ভেতরে পুঞ্জীভ‚ত নানামুখী আবেগের তীব্র উৎসারণ আমাদের চোখে এড়ায় না। সাম্প্রতিক কালে জীবিকাসূত্রে টিভি পর্দার বর্ণাঢ্য জগতে জড়িয়ে গেলেও কবিতার কুহক থেকে রিফাত বেরিয়ে আসতে পারেননি। তিনি চানও না। মাঝে মাঝে সাময়িক ছেদ পড়েছে, কিন্তু তাঁর কবিতা বরাবরের মতোই প্রাণময়।

রিফাত চৌধুরীর কাব্যযাত্রার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় তাঁর বর্তমান গ্রন্থেও। নানা অপ্রচলিত ধরন ও চরিত্রের কবিতার বই প্রকাশ করেছেন কবিতায়-সমর্পিত এই কবি। আমরা কোথাও তাঁর চরিত্রলন, কবিতার প্রতি অঙ্গীকারের অর্থে, দেখতে পাই না। তাঁর প্রজন্মের একজন স্বতঃস্ফূর্ত এবং বাস্তবে ও কল্পনায় সমানভাবে আবিষ্ট কবি হিসেবে বাংলাদেশের কবিতায় 'নতুন কবি স্মরণে' গ্রন্থটি তাঁর স্থানকে আরো সংহত করবে নিঃসন্দেহে।

জনৈক কবিতাকর্মী

জিন্দাবাদ

সাড়া জাগানো ছবি করে পরিচালক রুবাইয়াত রহমান খুব একটা হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন।
কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ছবি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাহাজোট সরকার ছবিটিকে নিষিদ্ধ করে দেন।
'মেহেরজান', জিন্দাবাদ! 'রুবাইয়াত হোসেন', জিন্দাবাদ!
'জয়া বচ্চন', 'শায়না আমিন', জিন্দাবাদ! 'ভিক্টর ব্যানার্জী', জিন্দাবাদ!
মিছিলের শোগান নয়। হৃদয়ের শোগান। ভাল লাগার শোগান।